

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182 Q5.

Book No. 916.14.

N. L. 38.

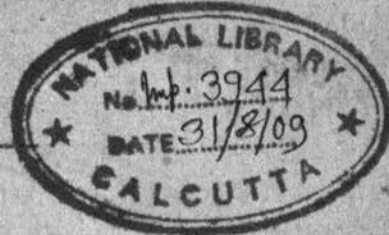
MGIPC—S8—37 LNL/55—14-3-56—30,000.

182. 26. 916. 14.

আয়ুর্বেদ

আর্য্যচিকিৎসাবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক
মাসিকপত্র ও সমালোচক।

RARE BOOK



মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ দেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এল,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম, বি,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ,
কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীতলচন্দ্র কবিরত্ন
মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে

কবিরাজ শ্রীমত্যাচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কর্তৃক
সম্পাদিত।

৪র্থ বর্ষ

(সন ১৩২৬ আশ্বিন হইতে ১৩২৭ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

কলিকাতা

২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

অক্ষয় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞালয় হইতে

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত ও

২০২নং গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে

প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাঙ্কলসহ ৩/০।



চতুর্থ বর্ষের প্রবন্ধ সূচী

(বর্ণমালানুসারে)

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অনু করণে আনাদের স্বাস্থ্য ...	সম্পাদক	২৭৩
অঙ্গোপচার ...	ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যজীবন ভট্টাচার্য এল, এম, এস	২২২
আকন্দ ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন	৩৮৮
আঠারো ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	৩৪২
আনাদের কথা ...	সম্পাদক	২
আয়ুর্বেদ অম্লশীলন ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন	৪৮৮
আয়ুর্বেদের ইতিহাস ...	মহানিহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন	
	সরস্বতী এম. এ, এল, এম, এস ৬, ৫৩, ১০৩, ১৫০	
আয়ুর্বেদের উন্নতির অজুহাত ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বিজ্ঞানস্ব	৪৪২
আয়ুর্বেদে ফার ও অগ্নিপ্রয়োগ ...		২৪
আয়ুর্বেদে রক্তমোক্ষণ ...	শ্রী	১২৮, ১৬১
ওলাউঠা চিকিৎসা ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন ৮০, ১৩৭, ৩৮৫	
কচু ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যীশ চন্দ্র রায় এম-এ	৩২৩, ৩৬৫
কবিরাজীর কুতকাৰ্য্যতা ...	ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু এল, এম, এস	১০৮
কলিকাতা আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার ফল ...	"...	৫০৭
কলেরা কি বিস্মৃতিকা ? ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোজনারায়ণ সেন	২১২
কাজের কথা ...	সম্পাদক	৫০, ৯৮, ৪৬২, ৪৭৪
কানী আয়ুর্বেদ সম্মিলনীর পরীক্ষার ফল ...		৪৭২
কুলের কথা ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন	৪২৫
কোছরক ? ...	ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মজুমদার	২১১
খাত ও স্বাস্থ্য ...	রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম-ডি	২২২
চ্যবনপ্রাশের পুষ্কর ...	সম্পাদক	১১০
ডাক্তারের ডায়েরী ...	স্বর্গীর ডাঃ হেমচন্দ্র সেন এম, ডি	২৬৫
তুখকাদি তৈল ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর লোহ	১৭২
বন্দ সহিষ্ণুতা ...	শ্রী	৬৪
নববর্ষ (কবিতা) ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	৩০২
নাড়ীচক্র ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	৪০৩
নিরামিষ খাদ্য ...	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র পাল	৮৬

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
পদ্ম	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরি প্রসন্ন রায় কবিরাজ	৪৬৪
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত স্বধাংগু ভূষণ সেনগুপ্ত	৫০৮
পল্লীগ্রাম ও ম্যালেরিয়া	... সম্পাদক	৪২৭
পল্লীগ্রাম ও স্বাস্থ্যবিধান	... শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৩
পল্লী প্রসঙ্গ	... সম্পাদক ৩৫০ ৩৭৯ ৪২৬ ৪৬৬	
পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন	... রায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীলাল বসু বাহাডর এম.ডি,	১৮১, ৩২৮, ৩৭৩
পল্লীস্বাস্থ্য	... সম্পাদক	১৪৫
পান দোষ	... শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী	৪৫
প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ, শ্রীযুক্ত কিতানন্দ লাহিড়ী	১৪১, ১৮৮, ২৫৮, ৩৮৪	
কলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও টোটকা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ	৩১১
বঙ্গ চূর্ণোৎসব	... সম্পাদক	৪
বঙ্গ বিজয়া (কবিতা)	... শ্রীযুক্ত ইন্দু ভূষণ সেনগুপ্ত	৪৯
বঙ্গ শিশুযুত্যা	... সম্পাদক	২০৮
বসন্তের প্রতিবেদকবিধি	... সম্পাদক	২২৫
বসন্তরোগের চিকিৎসা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র কণ্ঠাভরণ	১৮৫
বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য	... সম্পাদক	৪৬১
বাঙ্গালার স্বাস্থ্য	... সম্পাদক	২২৩, ২৫২
বালক রক্ষা	... শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় চট্টোপাধ্যায় বি, এল	৩০
বিবিধ প্রসঙ্গ	... সম্পাদক ৪৮, ৯৫, ১৪২, ১৯০, ২৭০, ৩৯২, ৪৩২, ৫০৫	
বিরজা বিয়োগ	... সম্পাদক	২৭০
বিবচিকিৎসা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত অভুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরাজ	৯২
ব্যারাম প্রসঙ্গ	... হিন্দুস্থান	৩০৫
মকরম্বজের ব্যবহার প্রণালী	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিগাগাধ্য	৩৮০
মঙ্গলাচরণ (কবিতা)	... শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত	১
মস্তিষ্ক কাহিনী	... হিন্দুস্থান	৩২০
মুষ্টিযোগ ও টোটকা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত স্বধাংগু ভূষণ সেনগুপ্ত	৪১, ৯০
মুষ্টিযোগ ও টোটকা	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিগাগাধ্য	২২৭
ম্যালেরিয়ার মুষ্টিযোগ	... কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেন	৪৬৫

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বন্ধুত্বের সংকীর্ণতা ...	হিন্দুস্থান	১৭৩
রজঃস্বলা নারীর স্বাধীনতা ...	ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাস	১৬
রস বিজ্ঞান ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ	১১৪
রোগ আরোগ্যে আয়ুর্বেদের শক্তি	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিভাভূষণ	৪৪৭
শারীর বিজ্ঞান ...	মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন	
	সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস	১৯৩, ২৩৩, ২৭৯
		৩১৩, ৩৫৩, ৩৯৩, ৪৫০, ৪৭৭
শিশুচিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা	কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন	
	এম-এ, এম, বি	৪৩, ৭২
শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন	
		২২৮, ২৬৮
শিশু মজল ...	সম্পাদক	৩৭৭
শিশুপালন ...	শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ সরস্বতী	১৮, ৬৬, ১২৪
		১৬৯, ২০১, ২৪৬, ২৯৪, ৩৩৩, ৩৬৯, ৪২০, ৪৩৩
শিক্ষার ব্রহ্মচর্য ...	কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ	
	কবিত্বষণ	৪৩৬
শেষক কার্পাস ...	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্তগুপ্ত	৯৭
সফল চিকিৎসা ...	সম্পাদক	৭৫
সমালোচনা ...	সম্পাদক	১৪৩, ১৮৯, ২৬৯, ৪৭০
স্বর্গীয় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত ...	সম্পাদক	৩০৭
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ...	ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মজুমদার এইচ, এল, এম, এস	
		১৩৩, ১৬৬, ৪২৮, ৪৯১
স্বপ্নত (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ বিভাবিনোদ	৯৭
স্বপ্নদেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যিকতা		
আছে কিনা ? ...	শ্রী	১৭৫, ২১৪, ২৫৫, ৩০৩
স্ব্য রশ্মির সহিত শারীরিক সম্বন্ধ	ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাস	৩৪০
জ্বলিগের হাঁপছাড়া ...	হিন্দুস্থান	২৬৩

আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক ।

৪র্থ বর্ষ ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—আশ্বিন ।

১ম সংখ্যা ।

মঙ্গলাচরণ ।

—:~:—

(শ্রীহিন্দুভূষণ সেন গুপ্ত)

দু্যলোক হইতে ভুলোকে চিকিৎসা প্রথম শিক্ষা যাঁ'র,
দীক্ষা যাঁহারি পীড়িতের তরে নাশিতে রোগের ভার ।
ব্যাদি-প্রপীড়িত সমগ্র বিশ্ব দেখিয়া ব্যথিত প্রাণে,
শিক্ষা যাঁহারি আয়ুর্বেদ ইন্দ্র-সম্মিধানে,—
তাঁহার চরণে আবার স্মরণ লইতেছি নববর্ষে,
এস ভরদ্বাজ ! কর আশীর্বাদ, বিশ্ব মাতুক হর্ষে ।

এস আত্রেয়, এস ঋষিগণ ! রক্ষিতে নিখিলবাসী,
এস অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ—লইয়া আশীষ রাশি ।
এস পরাশর, এস গো হারীত, এস ঋষি ক্ষারপাণি,
অনন্তদেব, এসগো আবার লইয়া “চরক” থানি ।
এস ধন্বন্তরি—দিবোদাস রূপে লইয়া সহস্র শিষ্য,
বিশ্ব মাঝারে ফুটিয়া উঠুক আবার মধুর দৃশ্য ।

“অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা” লইয়া সৌম্য মূরতি ধ'রি,
এস গো ‘বাভট’, তোমার চরণে কোটি নমস্কার করি' ।

এস গো সুশ্রুত—শারীর বিজ্ঞা প্রথম প্রচার যঁার,
তোমার চরণে গললগ্নী হ'য়ে প্রণিপাত বারবার।
প্রাচীন কাহিনী নূতন করিয়া শুনাইব নববর্ষে,
(ওগো) কর আশীর্বাদ সকলে মিলিয়া—বিশ্ব মাতৃক হুর্ষে।

আমাদের কথা।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

দিনের পর দিন বাইল, মাসের পর মাস কাটিল, এমনই করিয়া আবার একটি বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমাদের বড় আশার—বড় আকাঙ্ক্ষার—বড় সাধের—বড় আদরের “আয়ুর্বেদে”রও এমনই করিয়া আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল,—“আয়ুর্বেদ” তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল।

আয়ুর্বেদের উন্নতি কামনায় আয়ুর্বেদীয় মাসিক পত্র ইতঃপূর্বে কয়েকখানি বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার প্রায় সকল গুলিই অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে। “চিকিৎসাসম্মিলনী”র অস্তিত্ব নাই,—“সমীরণ” বন্ধ হইয়া গিয়াছে, “আয়ুর্বেদ পত্রিকা” বিলুপ্ত, বৈজ্ঞানিকজীবনী ও জীবন হারা। কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, ২টি কারণ স্বভাবতঃই উপলব্ধি হয়। ১ম—দেশবাসী চিকিৎসক মণ্ডলী চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রের নিকট যে ধরণের সন্দর্ভাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, এ মাসিক পত্রগুলি হয় সেভাবে পরিচালিত হয় নাই;

না হয় বৈজ্ঞিক চিকিৎসার উন্নতি কামনায় জ্ঞান গভীরগবেষণা সম্বৃত্ত প্রবন্ধাদির প্রচার কল্পে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ প্রদানে অনভ্যস্ত। আমাদের অনুমানের দুইটি কারণই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ শেষোক্ত কারণটি যে “আয়ুর্বেদে”র অদৃষ্টেও খাটিতেছেন, তাহা নহে, আমরা সেটুকু উপলব্ধি করিয়াই আয়ুর্বেদের নীরস কথাগুলিকে সরস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ভিন্ন অনেক ডাক্তার, ব্যবহারজীবী এবং দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি এইজন্যই “আয়ুর্বেদের” গ্রাহক থাকিয়া ইহা যথারীতি পাঠ করিয়া থাকেন। গত তিন বৎসর কাল “আয়ুর্বেদ” এই ভাবেই পরিচালিত হইয়াছে।

বাস্তবিক আয়ুর্বেদীয় প্রসঙ্গ করিতে হইলে শুধু যে চিকিৎসার কথাই বলিতে হইবে, ব্যাধির নিদান বলিতে হইবে, রোগ-প্রশমনের উপায় বিধিই বলিতে হইবে,—ব্যাধি প্রপীড়িত আর্ন্তগণের কিরূপ ঔষধে—কিরূপ নিয়মে—

কিরূপ পথো চলা উচিত—এই সকল কথাই আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা করিলেই এ সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইবে, এমন ধারণা ঠিক নহে,—আয়ুর্বেদের কথা সাধারণকে বুঝাইতে হইলে, রোগ প্রতীকারের উপায়-বিধির মত যাহাতে লোকে ব্যাধি প্রাপ্তি না হয়, ঋষি প্রদর্শিত নিয়ম সকল পালন করিয়া—অবহিত চিত্তে শাস্ত্রোপদেশ রক্ষা করিয়া—সদাচার ও সমুত্তিপরায়ণ হইয়া যাহাতে দেশবাসী আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এক কথায় রোগাক্রমণের প্রতিষেধক বিধি সকলই সর্বোপযোগী আলোচনা করিতে হইবে। আয়ুর্বেদের সেবা করিতে গিয়া আমরা সেই বিষয়টির উপরই সর্বোপযোগী লক্ষ্য রাখিয়া থাকি।

দেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, অধুনা বঙ্গজননীর অধিকাংশ সম্ভানই রোগের যন্ত্রণায় কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, নিত্য নূতন নূতন রোগাক্রমণের তাণ্ডব লীলায় বঙ্গজননী কিরূপ ভীতা কম্পিতা—সে কথা তো আর কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ম্যালেরিয়ার বাঙ্গালা-শাস্ত্রান হইয়াছে, ওলা-দেবীর রূপায় প্রতি বৎসর বঙ্গমাতার অসংখ্য অসংখ্য সম্ভান অকালে কালকবলিত হইতেছে, —ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, বাঙ্গালার সংহার মুক্তি ধারণ করিয়াছে—ইহার জন্ত তো প্রতীকারের চিন্তা করিতেই হইবে, কিন্তু

সেই সঙ্গে সেই সকল রোগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালী যাহাতে অব্যাহত থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টা যে সর্বোপযোগী আবশ্যক। ঘরে আশ্রয় লাগিলে জল ঢালিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা আশ্রয় লাগিবার পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য নহে কি? আমরা সে কথাটা আগে ভাবি নাই, সেই জন্তই তো আজ বাঙ্গালার এই অবস্থা।

আসল কথা—দেশের এই দুর্দিনে আশ্রয়-বান্ধির লীলা নিকেতন বঙ্গমাতার সম্ভানদিগকে আশ্রয়লাভের উপায় করিতে হইলে সংসার পরিচালনা বিষয়ে আবার তাহাদিগকে সাবধক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, সাবধক সরঞ্জাম অনুসরণ ভিন্ন তাহার যে আর গত্যন্তর নাই—এ কথাটা তাহাকে সর্বপ্রকারে বুঝিতে হইবে। —গত তিন বৎসরে—আমরা সেই উদ্দেশ্য লইয়াই আয়ুর্বেদ পরিচালন করিয়াছি—এবং এখনও তাহাই করিব। আমাদের পুরাতন পাঠকগণ আমাদের সঙ্কল্প অবগত আছেন,—নূতন পাঠকদিগকে আমাদের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিবার জন্ত আমাদের সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া—আয়ুর্বেদের আবিষ্কার কর্তা দেবতাদিগকে ও ও প্রচার কর্তা আৰ্য্য ঋষিগণকে উদ্দেশ্য প্রণাম করিয়া, আবার কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম, দেবতা ও ঋষিগণের আশীর্বাদ সহায় হউন—ইহাই গুরুজনের নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

—:~:—

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

আবার মহা পূজার সাড়া পড়িল। জগ-
জ্ঞানী আনন্দময়ীর আগমনের বার্তা বঙ্গ-
বাসীকে জানাইবার জন্ত ললিত-বিভাসের
আলাপে আবার নহবতের বাজ বাজিয়া উঠিল।
মায়ের শ্রীচরণ-সরোজে স্থান পাইবে বলিয়া
রক্তজবা গর্ভভরে আবার ফুটিয়া উঠিল।
কুমুদ-কল্লারও রক্তজবার মত ক্রতকৃতার্থ
হইবার বন্ধ সংস্কারে মধুর হাস্যে আত্ম বিকাশ
করিতে লাগিল।

মা আসিতেছেন—এ হেন মধুর দিনে
বাঙ্গালীর আর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই।
চিরকর্ণকান্ত-বাঙ্গালী কয়দিনের জন্ত বিশ্রাম-
সুখ উপভোগ করিবে,—প্রিয়জন-সন্দর্শনে
বহুদিনের অদর্শন জনিত কত আবেগ উচ্ছ্বাস—
কত মর্মব্যথা—কত পুরাতন কাহিনী প্রকাশ
করিয়া, কত মধুর আনন্দ—কত অনির্বচনীয়
তৃপ্তি অনুভব করিবে, পতি, পত্নীর সহিত, পিতা,
পুত্রের সহিত, ভ্রাতা, ভগ্নীর সহিত, সখা,
স্বহৃদদের সহিত, মিত্র, বান্ধবের সহিত, প্রবাসী,
স্বদেশীর সহিত মিলিত হইবে,—কত কথা—
কত কাহিনী—কত গল্প—কত পরামর্শ—
কত আকাঙ্ক্ষা—কত কামনা—পরস্পরের
মধ্যে আদান-প্রদানে পরস্পরে পরম সুখ—
চরম স্তুতি—প্রাণভরা তৃপ্তি উপলব্ধি করিবে।
কত হাসি ছুটিবে, কত আবেগ উঠিবে,
কত উচ্ছ্বাস বহিবে। মা এই রঙ্গ দেখাইবার
জন্তই বর্ষে বর্ষে বঙ্গে আগমন করিয়া থাকেন।
এবারও আসিতেছেন। তাই তাঁহার আগমনের

সাড়া পাইয়া বঙ্গবাসী আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অনায়াস
বর্ষের মত এবার যে আর হর্ষভরে মাতিয়া
উঠিতেছে না। সে আনন্দের আবেগ, সে
স্বথের স্তুতি,—সে প্রাণভরা তৃপ্তি—এবার
যে দৈন্ত-দারিদ্র্যে তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত
হইয়াছে। বাঙ্গালী উদরপূর্তির উপযুক্ত
অশন পাইতেছে না,—লজ্জা রক্ষার মত
তথা ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী বসন পাইতেছে
না,—অশন-বসনের সকল সামগ্রীই সম্মুখে
রহিয়াছে,—কিন্তু দুর্ন্যাস্যতা নিবন্ধন ক্রম করিয়া
সাধ পূর্ণ করিবার সক্ষমতা নাই,—তাহার
উপর ম্যালেরিয়া কলেরা ইনফ্লুয়েঞ্জার তাণ্ডব
নৃত্যে বাঙ্গালী গত বৎসর যেরূপ চক্ষে অন্ধকার
দেখিয়াছে, তাহাতে জগজ্ঞানী আনন্দ-
ময়ীর আগমনের সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিলেও
প্রাণথুলিয়া এবার যে আর বাঙ্গালী আনন্দে
মাতিতে পারিতেছে না।

রোগের আলা—শোকের আলা, তাহার
উপর সর্বাপেক্ষা পেটের আলা যে বড় আলা।
ছুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল বদন ব্যাদানে সমগ্র
বঙ্গ যে এবার ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে।
বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য তণ্ডুল হইতে সমস্ত
দ্রব্যই যে দুর্ন্যাস্য। বাঙ্গালী পেটের ভাত—
গরনের কাপড় সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।
পূজার আনন্দে বাঙ্গালী মাতিবে কি করিয়া!
সেইজন্ত আনন্দময়ীর আগমনে এবার অনেকেই
আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ উপভোগ করি-

তেছে। বালস্বলভ-চাপল্যের আকাঙ্ক্ষা—ধনী-দরিদ্র বিচার করিতে পারে না, অবস্থাহীন দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালীর সন্তান-সন্ততি মহামায়ায় পূজার সময় নূতন বেশ বিভাসের আকাঙ্ক্ষায় যে সারা বৎসর উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। এবার দরিদ্র বাঙ্গালী-জনকের পক্ষে তাহাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সামর্থ্য নাই। কিয়দ্বিঘ্ন পূর্বে সংসার-সমুদ্রে নানা-ঝঙ্কাবাতের মধ্য দিয়াও কতক কষ্টোপার্জিত অর্থ ব্যয় এবং কতক ঋণ করিয়াও যাহারা কতাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ঘটাপূর্ণ তন্ময়ের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাঁহাদের সন্ততিগণ তাঁহাদের কোপপ্রবণা স্বশ ঠাকুরাণীর কোপ নয়নে পতিতা হইবেন, কিন্তু অবস্থার ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই। জমীদারের খাজনা, উত্তমণের ঋণের সুদ, বিপণীর মহাজনদিগের প্রাপ্য—মহাপূজার সাড়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলই পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা বজের চিরন্তন রীতি। কিন্তু এবার এই দুর্কৎসরে বাঙ্গালী ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া সে ব্যবস্থা করিবে কি করিয়া! কাজেই মায়ের আগমনে বাঙ্গালী এবার সত্য সত্যই আকুল হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল ভক্ত সাধক সারা বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্বক সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াও অতি কষ্টে বর্ষে বর্ষে জনজ্ঞানীকে জীর্ণ আটচালায় আনিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন, যাহাদের কল্যাণে কত পল্লীবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা আত্মশক্তির স্বরূপ দর্শনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন,—তাঁহাদিগের মধ্যে এবার অনেকেরই পুণ্য আটচালার শূণ্য বেদিকা পূর্বস্থিতি জাগাইয়া দিতেছে মাত্র। ফলে বিশ্ব-

মাতার আরাধনা করিতে না পারিয়া,—জবা বিবদলে জগন্মাতার পূজা করিতে না পারিয়া,—পরমামৃত—বিশ্ব জননীর চরণামৃত ভক্তিভরে পান করিতে না পারিয়া, এবার যে কত ভক্তের প্রাণ আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

কত নবোঢ়া পত্নী—পতি সন্দর্শন কামনায় আশাপথ চাহিয়াছিল, অনেকের সে আশা এবার অপূর্ণই থাকিল, দারুণ অর্থ কষ্টে নব বিবাহিত স্বামী এবার যুবতী বনিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, শুধু প্রীতিপূর্ণ পত্র লিখিয়াই নিরুতি পাইলেন। কত পতিগত প্রাণা পত্নী—স্বামী সন্দর্শন জনিত অপার স্নেহ উপভোগে ধনমনা হইলেন বটে, কিন্তু পূজা উপলক্ষে তাঁহাদিগের প্রার্থিত দ্রব্য সস্তার প্রাপ্তির অভাবে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণমনাও হইলেন। কত যুবতী অল্পদিন পূর্বে তাঁহার এক সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীর সহিত “সখি” সম্পর্কে কুটুস্থিতা পাতাইয়াছিলেন, যাহার সহিত সে সম্পর্ক পাতান হইয়াছিল, তিনি জানিতেন, সখীর স্বামী দূর প্রবাসের একজন গণ্যমান্ত চাকরে পুরুষ,—বঙ্গে মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান উপঢৌকন পাইয়া তিনি কিছু লাভবতী হইবেন, কিন্তু তাঁহার সে কামনা এবার অপূর্ণই থাকিল, সখীর স্বামী এবার ব্যয় বাহুল্যে একরূপ ক্রিষ্ট যে, পত্নীর মনস্তুষ্ট করিতে তাঁহার নূতন উপকুটুস্থিনীর জন্ত একখানি বস্ত্র পর্য্যন্তও আনিতে পারেন নাই।

ফলে এবার দেশের বড়ই দুর্দিন। আনন্দ-ময়ীর আগমনে বাঙ্গালী এবার প্রতিকার্যো—প্রতি বিষয়েই নিরানন্দ উপলব্ধি করিতেছে। বাঙ্গালীর মনে স্নেহ নাই, হৃদয়ে বল নাই, প্রাণে স্বর্গ নাই, চিতে শান্তি নাই,—আশান্ত

হৃদয়ে বঙ্গ জননীর অনেক সন্তানই এবার আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। “সুজলা সুফলা মলয়জ নীতলা শস্ত্র শ্রামলা”—বঙ্গ জননীর সন্তানগণ এবার অসম্ভাবে যে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, এই নিরানন্দের কারণই তাহাই।

কিন্তু মা বিশ্বরূপিণী! তোমার আগমনে বিশ্ববাসীর হৃৎকণ্ঠ—দৈত্য-দারিদ্র্য—সবই যে অপনোদিত হইবার কথা মা! তুমি যে মা অন্নপূর্ণা! হৃগতি দূর করিবার জন্যই ‘হৃগা’—নাম ধরিয়াছ। দেশের এই ভীষণ হৃগতি দূর করিয়া, অন্নপূর্ণা মূর্তিতে বাঙ্গালার আগমন করিয়া, তোমার অকৃতি সন্তানগণের সকল কষ্ট—সর্ব প্রধান অন্নকষ্ট অপনয়ন কর না মা! অথবা রঙ্গময়ী—তুমি রঙ্গ দেখিতেছ,—তোমার সন্তানগণ তোমাকে ভুলিয়া, তোমার শাস্ত্রদেশ ভুলিয়া,—অথাগু-কুথাগু—অমিত্র-অহিত দ্রব্যসকল ভক্ষণ করিয়া—আর্য্য সন্তান অনেক বিষয়েই অনার্য্যের মত আচরণ অবলম্বনে এতদিন যে পাপ পণ্য অর্জন করিয়াছে, তাহারই ফলভোগের জন্য—আজি তাহার এই ভীষণ অবস্থা, সেইজন্য ভীষণ অবস্থা সন্দর্শন করিয়াও তুমি তাহার প্রতিকারকল্পে চেষ্টাবতী না হইয়া রঙ্গ

দেখিতেছ। কিন্তু সক্রম হৃদয়া দয়াবতী জননী আমার! আর যে তোমার রঙ্গ দেখিবার সময় নাই, বাঙ্গালা যে ছারখারে যাইবার উপক্রম হইয়া পড়িল,—আর রঙ্গ দেখিলে চলিবে না,—রোগ হইয়াছে—ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে—ঔষধই রোগের প্রতীকারের উপায়। জননী আমার! রঙ্গ ছাড়িয়া, রোগ বুঝিয়া, বাঙ্গালীকে ইহা তাহার কৃতকর্মের ফল উপলব্ধি করাইয়া—তাহার প্রাণে অনুশোচনার বীজমন্ত্র প্রয়োগ কর—অনুতাপে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় জর্জরিত হউক—সেকালের সদাচার-নিরত শুদ্ধস্বভা বাঙ্গালীর মত এ কালের বাঙ্গালী আবার পূর্ব অভ্যাসে অভ্যস্ত হউক,—স্বধর্ম ত্যাগী—স্বকর্ম ত্যাগী বাঙ্গালী সন্তান আবার সনাতন ধর্মে—স্বজাতির কর্মে অভিনিবিষ্ট হউক—বাঙ্গালা হইতে ছুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী হৃদয় ছাড়িয়া পলায়ন করিবে,—বাঙ্গালার হৃৎকণ্ঠ-দারিদ্র্য অপনোদিত হইবে,—অধুনা অস্থিকঙ্কাল সর্বস্ব-দৈত্য-কণ্ঠের আকর স্থল বঙ্গভূমি—আবার সোনার বাঙ্গালা নাম ধারণ করিয়া—মাতৃ পূজায় আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বিমলানন্দ লাভে সমর্থ হইবে।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

—:—

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী এম-এ, এল, এম-এস)

আয়ুর্বেদের ইতিহাস আলোচনা করিতে পর্য্যাপ্ত কালকে চারিটা ভাগে বিভক্ত করা হইলে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি হইতে বর্তমান যুগ যাইতে পারে। প্রথমতঃ—দৈবকাল; দ্বিতীয়তঃ

—আর্যকাল বা সংহিতা কাল ; তৃতীয়তঃ—
সংগ্রহ কাল, চতুর্থতঃ—অবনতি কাল ।
বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদের পুনরুত্থানের
আরম্ভকালও বলা যাইতে পারে ।

দৈবকাল—প্রথমে ভগবান ব্রহ্ম
নিখিল জীবের আরোগ্যপ্রদ শাস্ত্র আয়ুর্বেদ
স্বরূপ করিয়া লক্ষপ্লোকময়ী “ব্রহ্ম সংহিতা”
রচনা করেন । ব্রহ্ম হইতে প্রজাপতি দক্ষ,
দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়
হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন ।
ইহার ফলে “ব্রহ্ম সংহিতা”র পরে “প্রজাপতি
সংহিতা” “অশ্বিনী সংহিতা” ও “বলভিঃ
সংহিতা” বা “ঐন্দ্র সংহিতা” রচিত হইয়া-
ছিল ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা
ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ দেখিয়া আয়ুর্বেদ
নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন । ব্রহ্মা হইতে
সূর্য্য আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া “সূর্য্যসংহিতা”
নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন । সূর্য্যের
বহু শিষ্য আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথক্ পৃথক্
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে ভগবান
ধন্বন্তরি “চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞান,” দিবোদাস *
“চিকিৎসা দর্শন,” কাশীরাজ “চিকিৎসা
কৌমুদী,” অশ্বিনীকুমারদ্বয় “চিকিৎসাসার তত্ত্ব
ও ভ্রমর,” নকুল “বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব,” সহদেব
“ব্যাদিসিদ্ধি বিমর্দন,” বমরাজ “জ্ঞানার্ণব”
চ্যবন ঋষি “জীবদান,” জনক “বৈষ্ণব-সন্দেহ
ভঞ্জন,” চন্দ্রসুত “সর্ব্বসার,” জাবাল “তত্ত্ব-
সার,” জাজলি “বেদাঙ্গ সার,” শৈল “নিদান,”
করথ “সর্ব্ব-ধরতত্ত্ব” ও অগস্ত্য “দ্বৈধনির্ণয়
তত্ত্ব” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।

সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মত আয়ুর্বেদের
প্রচলিত মত হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ।

আর্যকাল—(১) কথিত আছে ভগবান
ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া
কাশীরাজ দিবোদাস রূপে ভূতলে অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন এবং ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরজ,
পৌঞ্চলাবত, করবীর্ষা, গোপুররক্ষিত, সূর্য্যত
প্রভৃতি ঋষিদিগকে শল্যতত্ত্বপ্রধান আয়ুর্বেদ
শিক্ষা দিয়াছিলেন । দিবোদাসের শিষ্য এবং
এবং অনুশিষ্যগণ শল্যতত্ত্ব প্রধান বিবিধ
আয়ুর্বেদ গ্রন্থ স্ব স্ব নামে রচনা করিয়া
গিয়াছেন । যে সকল চিকিৎসক ধন্বন্তরির
মতানুসারে চিকিৎসা করিতেন এবং
করেন, তাঁহারা ধন্বন্তরি সম্প্রদায় নামে
খ্যাত ।

(২) কায়তত্ত্বপ্রধান চিকিৎসা ব্রহ্মর্ষি ভর-
দ্বাজ কর্তৃক প্রচারিত হয় । কোন সময়ে
প্রাণীদিগের রোগ যন্ত্রণা দর্শনে ব্যথিত হইয়া
করুণহৃদয় ঋষিগণ তাহার প্রতিকারের উপায়
চিন্তার জন্য হিমাচলের সান্নিধ্যদেশে সমবেত
হইয়াছিলেন । সেই মহাসম্মেলনে তাঁহারা
চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, আয়ুর্বেদজ্ঞ ইন্দ্রের
শরণ গ্রহণ করাই ইহার একমাত্র উপায় ।
অনন্তর সকলের সম্মতি ক্রমে ভরদ্বাজ ঋষি
ইন্দ্রের নিকট গিয়া আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন ।
ভরদ্বাজ ঋষি আত্রেয়কে এবং আত্রেয় অগ্নিবেশ,
ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপাণি
নামক ছয়জন শিষ্যকে কায়চিকিৎসা প্রধান
আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন । আত্রেয় ঋষির
এই ছয় জন শিষ্য স্ব স্ব নামে সংহিতা রচনা
করিয়াছিলেন । ভরদ্বাজ ও আত্রেয় ঋষির

* দিবোদাস ও ধন্বন্তরি সূর্য্যত মতে একই ব্যক্তি । পুরাণের মত ব্রতন্ত্র ।

মতাম্বসারী চিকিৎসকগণ ভরদ্বাজ সম্প্রদায় বা আত্রের সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ দুইটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার। কার্যচিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Physicians—স্কুল অফ ফিজিসিয়ানস্) এবং শল্য চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Surgeons) স্কুল অফ সার্জেনস্) নামে অভিহিত।

কিন্তু প্রথমে এইরূপ দুইটি সম্প্রদায় গঠিত হইলেও কালক্রমে আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গের পৃথক ভাবেই পঠন পাঠন প্রচলিত হইয়াছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেমন বিশেষজ্ঞ (Specialist) আছেন, পূর্বে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশেরও সেইরূপ বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। সংহিতা ও সংগ্রহকারদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে পাঠক তাঁহাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে অবগত হইতে পারিবেন।

এই দুই সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রসবৈদ্যসম্প্রদায় নামে অভিহিত। চরক স্মৃতিাদি গ্রন্থে বিবিধ খনিজ দ্রব্যের অল্পবিস্তর উল্লেখ থাকিলেও ব্যবহার নিতান্ত কম দেখা যায়। তান্ত্রিক চিকিৎসায় পারদ এবং বিবিধ ধাতু উপধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, তন্ত্রের বক্তা মহাদেব। আদিম, নিত্যানাথ, চন্দ্রসেন, সোমদেব, গোবিন্দ, নাগার্জুন প্রভৃতি রসশাস্ত্রাচার্য্যগণ পারদের পরম রোগনাশকতা শক্তি দেখিয়া বিবিধ রসতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে,

বৌদ্ধযুগেই রসতন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ও প্রচলন ঘটিয়াছিল।

এক্ষণে আমরা আয়ুর্বেদের সংহিতা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। এই সকল সংহিতা অধুনা প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু টীকাকারদিগের উদ্ধৃত পাঠ দ্বারা প্রমাণিত হয় * যে, এই সকল গ্রন্থ টীকাকারদিগের সময়ে—কয়েক শত বৎসর পূর্বেও—বর্তমান ছিল। সম্ভবতঃ ভারতবাসী অদেয়ণ হইলে এখনও অনেক গ্রন্থ অবিকৃত হইতে পারে। যে সকল বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থের সংবাদ আমরা টীকাকারদিগের মুখে পাইয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কয়েক খানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কার্যচিকিৎসা তন্ত্র—

(WORKS ON THE PRACTICE OF MEDICINE)

১। অগ্নিবেশ সংহিতা। মহর্ষি

আত্রের শ্রেষ্ঠ শিষ্য অগ্নিবেশ এই সংহিতার প্রণেতা। ইহা আত্রের সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এক্ষণে যে গ্রন্থ চরক সংহিতা নামে পরিচিত, তাহাই অগ্নিবেশ সংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চরক উহার প্রতिसংস্কর্তা। কিন্তু বিজয়রক্ষিত, ত্রীকর্ণ প্রভৃতি টীকাকারগণ অগ্নিবেশের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি বর্তমান কালে চরক সংহিতায় পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, চরক সংহিতা অগ্নিবেশ সংহিতা নহে অথবা প্রতिसংস্কৃত হইয়া অগ্নিবেশ সংহিতার এত রূপান্তর ঘটিয়াছে যে, মূল

* এই সকল পাঠ মদীয় "প্রত্যক্ষসারী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থের সহিত অনেক স্থলে পাঠের সামঞ্জস্য নাই। মূল অগ্নিবেশ সংহিতা চরক ঋষির আবির্ভাবের পূর্বেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল; সেইজন্যই তখন তাহার প্রতিসংস্কার আবশ্যক হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, অঞ্জন নিদান নামক গ্রন্থ অগ্নিবেশের রচিত। কিন্তু চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতি কোন টীকাকারই অঞ্জননিদান হইতে পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই এবং উহার ভাষাও ঠিক প্রাচীন সংস্কৃতের ছায়া নহে। এইজন্য উহা অর্ধাচীন কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নিবেশ প্রণীত না হইলেও অঞ্জন নিদানে এরূপ সংক্ষেপে এবং সুন্দররূপে রোগের নিদান লিখিত হইয়াছে, যে, অল্পমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ।

২। ভেল-সংহিতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সংহিতা। বিজয়রক্ষিত, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকার ভেল-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও তাজোর নগরীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে খণ্ডিতাকারে বর্তমান আছে। প্রথমে উহার প্রতিলিপি ও পরে মূলগ্রন্থ দর্শনের সৌভাগ্য প্রবন্ধ লেখকের ঘটিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থহীচীকার বার্ণেল নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে বাগভট প্রধানতঃ ভেল সংহিতা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। এই মতের সার্থকতা বুঝা কঠিন।

কেহ কেহ বলেন যে, ভেলসংহিতা এবং ভালুকি-সংহিতা একই গ্রন্থ। কিন্তু সে মত সমীচীন নহে। উল্লানাচার্য্য সূত্রতন্ত্রের টীকায় “ভেল-ভালুকি” উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভালুকি-সংহিতা শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ। শল্যতন্ত্র

প্রধান গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে উহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩ জতুকর্ণ-সংহিতা—আত্রেয় সম্প্রদায়ের আদৃত এই গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত দুর্লভ। চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় জতুকর্ণ-সংহিতা হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪—৫। পরাশর সংহিতা ও ক্ষারপাণি-সংহিতা।

কেবল বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত নহে—পরশু শিবদাসও এই গ্রন্থদ্বয় হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, শিবদাসের সময়েও উক্ত গ্রন্থদ্বয় স্নলভ ছিল।

৬। হারীত-সংহিতা—চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠদত্ত এবং শিবদাসের সময়েও এই গ্রন্থ স্নলভ ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুর্লভ। হারীত-সংহিতা বলিয়া অধুনা যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা মূল হারীত-সংহিতা নহে। কারণ পূর্বোক্ত টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় হারীতসংহিতা হইতে যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ পাঠই মুদ্রিত হারীত-সংহিতায় পাওয়া যায় না, অধিকন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ বহুস্থলেই লিপিকর প্রমাদে পূর্ণ।

৭ খরনাদ-সংহিতা। বিজয়রক্ষিত হেমাদ্রি, অকণ্ঠদত্ত প্রভৃতি টীকাকারগণ খরনাদ সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি খরনাদি নাম দিয়া যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা খরনাদের অথবা খরনাদের পুত্রের বা অপর কাহার, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

৮ বিশ্বামিত্র-সংহিতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। চরক ও সুশ্রুতের টীকায় চক্রপাণি বিশ্বামিত্র-সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকাতেও বিশ্বামিত্র সংহিতার বচন দেখা যায়।

৯ অত্রি-সংহিতা। কাহারও মতে অত্রিসংহিতা অতি প্রাচীন, কাহারও মতে আধুনিক। প্রাচীনদিগের টীকায় অত্রিসংহিতা হইতে উদ্ধৃত পাঠ দেখা যায় না বলিয়া উহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ হয়। পঞ্চনদে অত্রিসংহিতা নামে বৃহৎ পুস্তক আছে, এইরূপ শুনা যায়।

১০—১১ কপিল তন্ত্র ও গৌতম তন্ত্র *—এই উভয় সংহিতার পাঠ সুশ্রুতের টীকায় ও নিদানের টীকায় উদ্ধৃত দেখা যায়।

২। শল্যতন্ত্র।

(WORKS ON SURGERY.)

১২—১৩ ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্র-তন্ত্র। এই তন্ত্র দুইখানির কেবল নাম মাত্র দেখা যায়। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ নিতান্ত বিরল। ডল্লন সুশ্রুতের ব্যাখ্যায় ঔপধেনব মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উহাদের সত্তা কেবল সুশ্রুতোক্ত পাঠ দ্বারাই অনুমিত হয়।

১৪ সৌশ্রুত তন্ত্র বা বৃদ্ধ সুশ্রুত। বৃদ্ধ সুশ্রুত বর্তমান সুশ্রুত সংহিতার মূলীভূত। কেহ কেহ উভয় সুশ্রুতকে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত হইতে কোন কোন পাঠ প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায় না। টীকা কার শিবদাস ও বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে পাঠ উদ্ধৃত

করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যে, শিবদাসের সময়েও বৃদ্ধ সুশ্রুত স্ফুট ছিল।

১৫। পৌকলাবত তন্ত্র। চক্রপাণি সুশ্রুতের টীকায় পৌকলাবত তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৬। বৈতরণ তন্ত্র। ডল্লন ও চক্রপাণি স্ব স্ব টীকায় বৈতরণ তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুতে অল্পস্বল্প বহু বিষয়ের পাঠ টীকাকারেরা এই গ্রন্থ বহিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়, যে, সুশ্রুত অপেক্ষা উক্ত তন্ত্র বৃহত্তর ছিল।

১৭। ভোজতন্ত্র বা ভোজসংহিতা। টীকাকারগণ ভোজতন্ত্র হইতে অনেক নূতন বিষয়ের প্রচুর পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেজন্ত অনুমান হয়, যে, ভোজতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় মহর্ষি ভোজ সুশ্রুতাদির সতীর্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইজন্ত ভোজতন্ত্র ধারেশ্বর ভোজরাজের রচিত নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভোজরাজের রচিত রাজমার্ত্তণ্ডাদি যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ আছে, সেগুলি ভোজসংহিতার অনেক পরবর্ত্তিকালে রচিত। ভোজরাজ অপেক্ষা ভোজমুনি বহু প্রাচীন, তজ্জন্ত কেহ কেহ ইহাকে বৃদ্ধ ভোজ ও বলিয়া থাকেন।

১৮। করবীৰ্য্যতন্ত্র। টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে কদাচিৎ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই জন্ত টীকাকারদিগের সময়ে করবীৰ্য্যতন্ত্র বহু প্রসিদ্ধ ছিল না বলিয়া প্রতীতি হয়।

১৯। গোপুররক্ষিত তন্ত্র। এই তন্ত্র আছে শুনা যায় মাত্র, তদুদ্ধৃত পাঠ প্রায়

* ঋষি প্রণীত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সমূহ তন্ত্র এবং সংহিতা উভয় নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মশায় নামে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা তন্ত্র।

কোথায়ও দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন—
গোপূর ও রক্ষিত ছই জন ব্যক্তি এবং ছই-
জনের রচিত ছই থানি তন্ত্র ছিল।

২০। ভালুকি তন্ত্র। পূর্বেই
বলা হইয়াছে, ভেলসংহিতা হইতে ভালুকিতন্ত্র
স্বতন্ত্র। উল্লন, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকর্প
ভালুকি তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।
চক্রপাণির উদ্ধৃত যন্ত্রশাস্ত্রাদির লক্ষণ সমন্বিত
অনেক বচন দেখিয়া বোধ হয় যে, এই তন্ত্র
শল্যতন্ত্রের একখানি প্রধান গ্রন্থ।

৩। শালাক্যতন্ত্র।

(WORKS ON DISEASES OF EYE,
EAR, NOSE, THROAT &c.)

২১। বিদেহতন্ত্র। বিদেহাধি-
পতি নির্মিত এই তন্ত্র শালাকীদিগের প্রধান
গ্রন্থ। ইহা বর্তমান সূত্রত গ্রন্থের শালাক্য
তন্ত্রাংশের মূলভূত—একথা সূত্রতেই আছে।
উল্লন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকর্প প্রভৃতি টীকাকার
এই তন্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।
বিজয় রক্ষিত জ্বর, আরোচক এবং পাণ্ডু প্রভৃতি
রোগেও বিদেহতন্ত্র হইতে কোন কোন পাঠ
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় শালাক্য-
তন্ত্র প্রধান হইলেও এই গ্রন্থ সূত্রতাঙ্গি গ্রন্থের
ভ্রায় সর্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, নিমি এবং বিদেহাধি-
পতি একই ব্যক্তি। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে।
কারণ উল্লন ও শ্রীকর্পদত্ত স্ব স্ব টীকায় নিমি
ও বিদেহ উভয়েরই পাঠ একই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত
করিয়াছেন। চরকে “জনকো বৈদেহঃ” পাঠ
থাকায় বুঝা যায় যে, পুণ্যলোক ভগবান জনক
রাজর্ষি এই তন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।

২২। নিমিতন্ত্র। পূর্বেই বলা
হইয়াছে যে, এই তন্ত্র বিদেহ তন্ত্র হইতে পৃথক।
শ্রীকর্প এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন,
সুতরাং তাঁহার সময়েও বিদেহতন্ত্র স্বতন্ত্র
ছিল।

২৩। কাক্ষায়ন তন্ত্র। চরকে
এবং উল্লনের টীকায় কাক্ষায়নের পরিচয় পাওয়া
যায়। কিন্তু এই তন্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ অত্যাধিক
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৪—২৫। গার্গ্যতন্ত্র ও গালব-
তন্ত্র। উল্লনের টীকায় শালাক্যতন্ত্র প্রসঙ্গে
গার্গ্য ও গালবতন্ত্রের উল্লেখ আছে মাত্র।
উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত কোন পাঠের
পরিচয় আমরা পাই নাই।

২৬। সাত্যকি তন্ত্র। ইহা
প্রাচীন শালাক্যতন্ত্র। উল্লন এবং শ্রীকর্পদত্ত
এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৭। শৌনক তন্ত্র। উল্লন ও
চক্রপাণি শৌনক তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত
করিয়াছেন। চরক এবং সূত্রতেও শৌনক
মতের উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্ভের অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গনিষ্পত্তি বিষয়ে চরকোদ্ধৃত শৌনক
মতের সহিত সূত্রতোদ্ধৃত শৌনক মতের
স্পষ্ট বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয়, যে, চরকোক্ত
শৌনক সূত্রতোক্ত শৌনক হইতে বিভিন্ন।
সম্ভবতঃ এই বিরোধ পরিহারের জন্ত চরক
মদ্রশৌনক অর্থাৎ মদ্রদেশীয় শৌনক এই পদ
প্রয়োগ করিয়াছেন। উল্লনের টীকায়ও মদ্র-
শৌনকের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। উল্লন এবং
চক্রপাণির উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে,
শৌনকতন্ত্র কেবল শালাক্যতন্ত্র মাত্র ছিল না,
পরন্তু শারীর ও ভেষজ কল্লনাদির বর্ণনাও
ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, অথর্ব বেদের শৌনক-সংহিতাকার শৌনকই শৌনকতন্ত্র প্রণেতা। কিন্তু অথর্ব-সংহিতাকার অতি প্রাচীন, শৌনকতন্ত্রকার তদপেক্ষা নবীন। পূর্বে এক নামের অনেক আচার্য্য তন্ত্রকার ছিলেন; কেবল নামের সাদৃশ্য দেবীয়া পরস্পরের অভেদ নির্দেশ করা সম্ভব নহে।

২৮। করালতন্ত্র। এই তন্ত্রকার করালকে ডল্লন করালভট্ট আখ্যা দিয়াছেন। ইনি ঋষি ছিলেন কি না স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ কোন ঋষিরই ভট্ট পদবী দৃষ্ট হয় না। তথাপি ডল্লন-শ্রীকণ্ঠাদির নির্দেশ দ্বারা জানা যায় যে, এই তন্ত্রকারও বহু প্রাচীন কালের।

২৯। চক্ষুযাতন্ত্র। কেহ কেহ ইহাকে “চক্ষুষ্ণেয় তন্ত্র” সংজ্ঞাও দিয়া থাকেন। শ্রীকণ্ঠদত্তের টীকায় এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। কৃষ্ণাত্রেয় তন্ত্র। কেহ কেহ বলেন, এই তন্ত্র পুনর্বর্ষ আত্রেয় নির্মিত। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণের উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে, শালাক্যতন্ত্রকার কৃষ্ণাত্রেয় কাম্যতন্ত্রকার আত্রেয় হইতে পৃথক ব্যক্তি।

৪। ভূতবিজ্ঞাতন্ত্র।

(WORKS ON MENTAL DISEASES.)

আয়ুর্বেদের ভূতবিজ্ঞা নামক অঙ্গ পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূতবিজ্ঞা তন্ত্রের গ্রন্থ পাওয়া দূরে থাকুক,

তন্ত্রের নাম পর্যন্ত টীকাকারেরাও উদ্ধৃত করেন নাই।

বর্তমানে আয়ুর্বেদে ভূতবিজ্ঞার বীজস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়টি প্রসঙ্গ দেখা যায়। যথা—

(১) সূক্ষ্মতে অমানুষ্য প্রতিষেধাধ্যায় (উত্তরতন্ত্র, ৬ অঃ)।

(২) চরকে উন্মাদ চিকিৎসাধ্যায় (চিঃ স্থা, ৯ অঃ)।

(৩) বাগ্ভটে ভূতবিজ্ঞানীর ও ভূত-প্রতিষেধ অধ্যায় (উত্তর, ৪৫ অঃ)।

সূক্ষ্মতে ও বাগ্ভটে ভূতবিজ্ঞা পৃথকভাবে লিখিত হইলেও চরকে উহা উন্মাদাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সহস্র বর্ষের পূর্বতন বাখ্যাকারগণও ভূতবিজ্ঞাতন্ত্রের কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই! সেইজন্য অনুমান করা যায় যে, ভূতবিজ্ঞা বহুকাল পূর্ব হইতেই লোপ পাইয়াছে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নিপুর্ণাণ্ড ও গরুড় পুর্ণাণাদিতে যথেষ্ট ভূতবিজ্ঞা প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয় যে, পৌরাণিক যুগেও ভূতবিজ্ঞা বিলুপ্ত হয় নাই।

চরক যে ভূতাবেশকে শুধু উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, বাতোন্মাদ চিকিৎসা এবং ভূতাবেশ চিকিৎসা প্রায় একই প্রকার বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে মানস রোগাধিকারই ভূতবিজ্ঞা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ উন্মাদাদি রোগে ভূতাবিষ্টের স্থায় নানা প্রকার বিকৃত অস্বাভাবিক আচরণ করে, অথচ অনেক স্থলেই উপযুক্ত ঔষধ তৈলাদি ব্যবহারে আরোগ্য হয়, ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেবগ্রন্থাদি সম্বন্ধে সূক্ষ্মতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে “ন তে নমুঘোঃ সহ সংবিশন্তি”—তাহারা মানুষের সহিত থাকে না মানুষের স্বর্গে চাপে না।

কিন্তু মাহুকের স্বল্পে ভূত চাপার এবং বলিহোমাদির কথাও বর্তমান সময়ের অনেক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে দেখা যায়। এইজন্য মনে হয়, শাস্ত্রের অবনতির সহিত অনেক কুসংস্কার এই ভূতবিজ্ঞায় প্রবেশ করিয়াছে। এই ধারণার জন্য আমরা ভূত-বিজ্ঞাকে মানস রোগাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিতে ইচ্ছুক।

৫। কোমারভূতা তন্ত্র।

(WORKS ON DISEASES OF CHILDREN).

৩১।৩২।৩৩। জীবক তন্ত্র, পার্ক-তকতন্ত্র ও বন্ধক তন্ত্র।—কোমারভূতা তন্ত্রেরও বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল।

স্বশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে ব্যাখ্যায় ডল্লন জীবক, পার্কতক ও বন্ধক নামক কোমারভূতা তন্ত্রকারদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের গ্রন্থ পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়।

জীবক প্রভৃতি তন্ত্রকার বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে জীবক নামক বৌদ্ধভিক্ জীবক “কোমারভূত” (কোমারভূতা?) সংজ্ঞায় বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি ভিক্ আত্রেয়ের শিষ্য এবং ভগবান বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধ রাজা বিশ্বসারের চিকিৎসক ছিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ আত্রেয়ই চরকোক্ত ভিক্ আত্রেয়—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু চরকে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষির সহিত ভিক্ আত্রেয় হিমালয়

মাছতে মিলিত হইয়াছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। ঐ সকল ঋষি বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্বকালীন। সুতরাং চরকোক্ত ভিক্ আত্রেয় এবং বৌদ্ধ ভিক্ আত্রেয় এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে।

চক্রপাণি স্বশ্রুতের ভানুমতী টীকায় কোমারভূতা তন্ত্র হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কাহার রচিত নির্ণয় করা যায় না।

৩৪। হিরণ্যাক্ষ তন্ত্র। ত্রীকণ্ঠ দন্তের উদ্ধৃত পাঠ দেখিয়া ইহা কুমারতন্ত্র প্রধান ছিল বলিয়াই মনে হয়।

স্বশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে দ্বাদশটি অধ্যায়ে কোমারভূতাতন্ত্র প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয় যে, আয়ুর্বেদের এই অঙ্গ পূর্বকালে সূক্ষ্ম ছিল, এক্ষণে নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে গর্ভাচার্য্যাদি বিষয় কোমারভূতা তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক শারীরের অন্তর্ভুক্ত এবং মৃদুগর্ভ (Difficult labour) চিকিৎসা শাস্ত্র তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রমত্তিতন্ত্র (Midwifery) কোমারভূতা তন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু স্বশ্রুতে যৌনব্যাপ্য-প্রতিষেধ অধ্যায়ের শেষে “ইতি স্বশ্রুতাচার্য্য বিরচিতৈ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উত্তর তন্ত্রে কোমারভূতা সমাপ্তম্”—এইরূপ পাঠ আছে। সেইজন্য বোধ হয়, প্রাচীনকালে জ্বরোগ কোমারভূতা তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬। অগদতন্ত্র।

(WORKS ON TOXICOLOGY).

যাবতীয় হাবর ও জঙ্গম বিষের পরিজ্ঞান

এবং চিকিৎসা অগদ তন্ত্র নামে খ্যাত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অগদ তন্ত্র এবং তদ্বিষয়ক প্রাচীন সংহিতাগুলি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। কেবল সূত্রশতের কল্পস্থানে এবং চরকের চিকিৎসা স্থানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অগদতন্ত্রমূলক প্রসঙ্গ আছে। আমরা অগদতন্ত্র বিষয়ক নিম্নলিখিত কয়েক খানি সংহিতার পরিচয় পাইয়াছি।

৩৫। কাশ্যপ সংহিতা। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, কাশ্যপ নামক ঋষি মহারাজ পরীক্ষিতের চিকিৎসার জন্ত আসিতে ছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তক্ষক কর্তৃক নিহাতি হইলেন। ডল্লন, চক্রপাণি এবং শ্রীকর্ক কাশ্যপতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ কাশ্যপতন্ত্রকে কায়চিকিৎসা প্রধান, অপরে শল্যতন্ত্র প্রধান বলিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতের কথিত সংবাদ, টীকাকার দিগের বিষচিকিৎসা সম্বন্ধীয় পাঠোক্তার এবং বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের প্রসিদ্ধি হেতু আমরা কাশ্যপ সংহিতাকে অগদতন্ত্র প্রধান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

৩৬। অলম্বায়ন সংহিতা। শ্রীকর্কদত্ত বিষনিদানের টীকায় অলম্বায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩৭। উশনঃ সংহিতা। উশনঃ কৃত এই সংহিতা অগদতন্ত্রমূলক বলিয়া বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিচয় পাওয়া যায়। উশনার পথ অনুসরণ করিয়া কোটীল্য স্বকৃত অর্থশাস্ত্রে বিষাদির প্রতীকার এবং আশুশৃঙ্গের পরীক্ষা * সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদ্বারা এই সংহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮। সনক সংহিতা (বা শৌনক-সংহিতা)। এই অগদতন্ত্রমূলক প্রাচীন গ্রন্থ পূর্বে বনগণ কর্তৃক স্বভাৱে অনুদিত হইয়াছিল—ইহা জার্মান পণ্ডিত মূলার কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অম্লসন্ধিৎসু পাঠক ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাসের (Dr. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry; Vol. 1. (Introduction) ex II.) ভূমিকা পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ পাইবেন।

৩৯। লাট্যায়ন সংহিতা। ডল্লন স্বীয় টীকায়লা ট্যায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৭। রসায়ন তন্ত্র।—

(WORKS ON METHODS OF GAINING HEALTH AND LONGEVITY).

জরাব্যাধি বিনাশের জন্ত ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্বেদের রসায়ন তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না। আয়ুর্বেদের আর্ষযুগে এবং বৌদ্ধযুগে এই তন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ঋষিগণ রসায়নের জন্ত প্রায় বনৌষধি প্রয়োগেরই উপদেশ দিয়াছেন, লৌহাদি প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং রসতন্ত্র আয়ুর্বেদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। রসায়ন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের একটি প্রধান অঙ্গ। সূত্রশত

* আশুশৃঙ্গক পরীক্ষার ইংরাজী নাম Post Mortem Examination. অধুনা বাহা Medical Jurisprudence বলিয়া খ্যাত, তাহা বোধ হয় পুণ্ড্র বাবহারায়ুর্বেদ নামে পরিচিত ছিল। এই সকল বিষয় উশনঃ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। কোটীল্যের অর্থশাস্ত্রে “কটন শোধন” একরূপ উল্লেখ।

লৌহ, শিলাজতু, মাক্ষিক প্রভৃতির এবং চরকে পারদ লৌহাদি ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে আর্ষ্যযুগে লৌহাদির কিছু কিছু প্রয়োগ থাকিলেও বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে পারদাদি খনিজ পদার্থ বহুলরূপে ঔষধার্থে এবং রসায়নের জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহা “রসশাস্ত্র” নামে পৃথক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ রসশাস্ত্র আয়ুর্বেদ হইতে পৃথক্ নহে। আর্ষ ও অনাৰ্ষ ভেদে রসায়ন তত্ত্ব দুই প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা আর্ষ রসায়ন তত্ত্বের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির পরিচয় পাইয়াছি।

৪০। পাতঞ্জল তন্ত্র। টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি এই তন্ত্র হইতে লৌহ-প্রয়োগবিধি স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪১। ৪২। ৪৩। ব্যাড়ি তন্ত্র, বশিষ্ঠ-তন্ত্র ও মাণ্ডব্যতন্ত্র। এই তিন খানি অতি প্রাচীন তন্ত্র রসতান্ত্রিকদিগের আশ্রয়ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত রসচাৰ্য্যগণের সূচীর মধ্যে ব্যাড়ি ও মাণ্ডব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাগার্জুনকৃত রস-রত্নাকরে বশিষ্ঠ ও মাণ্ডব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৪৪। নাগার্জুন তন্ত্র। কেহ কেহ বলেন যে, এই তন্ত্র নাগার্জুন নামক মুনির রচিত, অপরে বলেন ইহা সিদ্ধ নাগার্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্যের রচিত। চক্রপাণিকৃত সংগ্রহে গ্রন্থে নাগার্জুন মুনির এবং পাটলিপুত্রের স্তম্ভে আচার্য্য নাগার্জুনের উল্লেখ আছে। পাটলিপুত্র বৌদ্ধগণের বিহারক্ষেত্র ছিল বলিয়া শেখোক্ত নাগার্জুনকে বৌদ্ধাচার্য্য বলিয়াই মনে হয়। নাগার্জুন নামধারী

অনেক আয়ুর্বেদবিদ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কক্ষপুট তন্ত্র এবং আরোগ্য-মঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয়ও নাগার্জুনের রচিত। বিজয় রক্ষিত নিদানের টীকায় আরোগ্যমঞ্জরী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৮। বাজীকরণ তন্ত্র—

(WORKS ON SEXUAL
INVIGORATION.)

বাজীকরণ তন্ত্রের প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিশেষ পরিচয় এক্ষণে পাওয়া যায় না। প্রাচীন টীকাকারগণ এতদ্বিষয়ক কোন সংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া মনে হয় যে, সহস্র বৎসর পূর্বেই বাজীকরণ তন্ত্রের আর্ষ-সংহিতাগুলি লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বাজীকরণ তন্ত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্বে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাৎস্তায়নের কামসূত্রে “ঔপনিষদিক” অধিকারে নানাবিধ বাজীকরণ যোগের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে মহাদেবের অমুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়যুক্ত কামসূত্রের বর্ণনা করিয়াছিলেন। উদালকের পুত্র খেত-কেতু উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচশত অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। অনন্তর বক্রর পুত্র পাঞ্চাল উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সাত ভাগে বিভক্ত করেন। পরে দম্বক, চারায়ণ, সুবর্ণনাভ, ঘোটকমুখ, গোনর্দ, গোণিকাপুত্র এবং কুচুমার এই সাতজন সাতটি বিভাগ পৃথক্ৰূপে প্রচার করেন। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, পূর্বে কামসূত্রকার ঋষিদিগের প্রণীত ঔপনিষদিক

নামক বিভাগ আয়ুর্বেদে বাজীকরণ তন্ত্র নামে পৃথকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

৪৫। কুচুমার তন্ত্র। বাজীকরণ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান গ্রন্থ। বাৎস্তায়নের কামসূত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রাচীন বাজীকরণ তন্ত্র এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। উদ্দালকের পুত্র খ্যেতকেতু এবং বক্রর পুত্র পাঞ্চালের প্রণীত অতি বৃহৎ কামশাস্ত্রের ঔপনিষদিক অধিকার-দ্বয়ও দুইটি পুরাতন বাজীকরণ তন্ত্র ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও চাণক্য বা আচার্য্য কোটিল্যাই বাৎস্তায়ন, অপরে ইহাকে মুনি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যে মতই গ্রহণ করা যাউক বাৎস্তায়ন দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন-কালের। সুতরাং বাৎস্তায়ন কথিত ঔদ্ধালকি, বাজব্যা এবং কুচুমার কৃত তন্ত্র যে আরও প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

রজঃস্বলানারীর স্বাস্থ্য।

(ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস ।)

আমাদের কাছে আদর কিসের? স্বদেশের না বিদেশের? একটু বিবেচনা পূর্বক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, “বিদেশেরই আদর। আমরা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত। সুতরাং আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সবই বৈদেশিক। আবার ব্যবহারও ক্রমশঃ বৈদেশিক হইয়া যাইতেছে। এ কথায় হয়ত আপনারা বলিবেন, সে কি, আজকাল অনেকেরই স্বদেশা-মুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ কথার উত্তরে বলিতেছি যে, এই স্বদেশা-মুরাগও বৈদেশিক। অনেকেই হাসিবেন; বলিবেন এ যে সোণার পাথর বাটা।

আমাদের রত্নগর্ভা ভারতে সবই ছিল—সবই আছে। আৰ্য্য ধর্ম ও আৰ্য্যশাস্ত্রে সবই আছে, কেবল আমরাই অন্ধ। আমরা অধুনা

একটু একটু বাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাও বিদেশীর চক্ষে। ‘ছ’ পাতা ইংরাজি পড়িয়া যে সকল তত্ত্ব আমরা—ভ্রমাত্মক, গোঁড়ামি বা ভণ্ডামি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, সেই সকল তত্ত্বের কোনটী যদি কোন ইয়ুরোপীয় বা আমেরিকান সাহেব অশ্রান্ত ও যুক্তিবুদ্ধ বলিয়া সপ্রমাণ করেন, তখন আমরা বাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আবার আদরে গ্রহণ করিব ও স্বদেশ গৌরবে মাতিয়া বুক বাজাইব। আমাদের ঘরের জিনিষেরও আদর বিদেশীর চক্ষে। তাই বলিতেছি যে, একপ স্বদেশা-মুরাগকে কি বৈদেশিক বলা যায় না! আমাদের কোন প্রাচীন বর্ষের রীতি যদি বিদেশীর মতে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরাও উহাকে ভাল

বলিয়া মনে করি, নচেৎ উহা ভ্রমসঙ্কুল ও বর্ধরতা পূর্ণ বলিয়া পরিভ্রাণ্য। সুতরাং এক্ষণে জীবাশ্ব্য সম্বন্ধে যে একটা সামান্য কথার উল্লেখ করিব—উহাতে বিদেশীর মতান্তর গণই করিব।

বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল জীলোকদের মধ্যে রজঃকৃচ্ছ্র, স্বল্পরজঃ বা অতিরজঃ প্রভৃতি ঋতুবিপর্যয়ের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।—ইহার প্রধান কারণ—আমাদের চির প্রচলিত প্রাচীন রীতির উল্লেখন। হিন্দু প্রথাষায়ী রজঃস্বলা নারী অশুচি ও অস্পৃশ্য। এই অশুচি অবস্থায় তাঁহার স্পর্শিত খাণ্ডাদি তো দূরের কথা, তৎকালে তৈজসাদি পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। সে সময় তাঁহাদের স্পর্শিত বস্ত্রাদি অপরের—অপরিধেয়; তাহাদের স্পর্শিত জল অব্যবহার্য্য। এই সময় রজঃস্বলা নারীকে একান্ত নিভৃত কক্ষে বাস করিতে হয় এবং যাবতীয় গৃহকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। এতদ্ব্যতীত—তাঁহাদিগকে আহারীয় নিয়মও পালন করিতে হয়। ফলমূলাদি সাম্বিক আহার, ছদ্ম, অন্ন এবং কোন কোন উদ্ভিজ্জ সিদ্ধ রজঃস্বলা স্ত্রীর আহার্য্য। অত্যাখ্য খাদ্য অর্থাৎ উগ্র ও ছপ্পাচ্য খাদ্য ভক্ষণ অসম্ভব। রজঃস্বলা নারীর পক্ষে পুরুষের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এ নিয়ম কেবল আত্ম ঋতুর সময় অনেকে পালন করেন বটে, কিন্তু তাহার পর এ সমুদয় একেবারেই উপেক্ষিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ বলেন যে রজঃস্বলা স্ত্রীর পূর্ণ বিরাম গ্রহণ আবশ্যক, এমন কি পুস্তকাদি পাঠও নিষিদ্ধ। লঘুপাক ও অল্পশ্রমক খাদ্য তাঁহার পক্ষে উপযোগী। ঘৃত তৈল ভিজ্জিত বা মসলা সংযুক্ত উগ্র খাদ্যাদি

আখিন—৩

ভোজন তাহাদের পক্ষে একান্তই নিষিদ্ধ। শীতল বায়ু সেবন, জলে ভিজা, মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি পরিবর্জনীয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, একপু করিলে কেবল যে ঋতুরোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়—তাহা নহে; গর্ভিণীর সুখপ্রসব হয়। এমন কি প্রসব বেদনা আদৌ অমুভূত হয় না। হিন্দুর পদ্ধতি অনুসারে রজঃস্বলা রমণীকে অশুচি মনে করিয়া পূর্ণ বিরাম দেওয়া হইত। এই সকল নিয়ম আজকালকার শিক্ষিত সভ্য সমাজ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কোন কোন অশিক্ষিত ধর্ম্মভীরুদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, শিক্ষিত দলের মধ্যে সময়ে সময়ে ঋতুকালেও জী-পুং মিলনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—কিন্তু ইহা জী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অস্বাস্থ্যকর। এই জন্তই বোধ হয় স্ত্রীদর্শী শাস্ত্রকারেরা ঋতুকালে একেবারে পুরুষের মুখদর্শন পর্য্যন্ত জীলোকদিগের পক্ষে নিষেধ করিয়া ছেন। আবার ইহাও পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের কথা যে, রোগ আরোগ্য অপেক্ষা প্রতিষেধক ভাল। তাই বলি, একবার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়া দেখুন। তাহা হইলে আর ঘরে ঘরে Aletris cordial এলেকট্রিস্ কর্ডিয়ালের শ্রীদ্ধ করিতে হইবে না।

আবার ডাক্তার প্লিনি বলেন যে, রজঃস্বলা নারীর হস্ত কিছুক্ষণ সুরামধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়া পরে ঐ সুরা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উহা অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ঐ নারীর দ্বারা অল্প সময়ে পরীক্ষা করায় সুরার কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং সুরা বা দুগ্ধে যদি এইরূপ পরিবর্তন ঘটে, অত্যাখ্য খাদ্য ও পানীয়ে যে পরিবর্তন

ঘটিবে—তাহার আর বৈচিত্র্য কি। কার্পেন্টার তাহার ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্ব গ্রন্থে একটা রমণীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহার স্বামী পারদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, স্বামীর সহিত এক শয্যায় নিদ্রা ঘাইবার পর,

দ্বীর্ণ ও 'মুখ' আসিয়াছিল অর্থাৎ প্রচুর লাল্য নিঃসরিত হইয়াছিল। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে রজঃস্রাব নারীর সহিত একত্র বাসও যে অস্বাস্থ্যকর তাহার আর সন্দেহ কি?

শিশুপালন।

—:—

[উপক্রমণিকাংশ]

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী)

মানবের ঘরে একটি শিশুর জন্ম কত আনন্দ, উল্লাস এবং আশার বারতা আনিয়া দেয়। নবজাত শিশুটি যখন অফুটন্ত গোলাপের মত মাতার কোল আলো করিয়া শুইয়া থাকে, তখন, তেমনি আত্মীয়স্বজনের প্রাণে যেমন আনন্দ হয় সেই মুহূর্ত্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তায়ও তাঁহাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতে থাকে। শিশুর ভাবী গৌরবপূর্ণ জীবনের চিত্র কল্পনা চক্ষে দেখিয়া পিতামাতার বক্ষ কত আশার আনন্দে এবং উৎসাহে ফুলিয়া উঠে। শিশুর স্বর্গীয় জন্ম-মণ্ডিত মুখখানি দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর কি অপার্থিব রেহ ও আনন্দের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আবার শিশু যখন মাতার চক্ষের দিকে চাহিয়া মধুর হাসি ছড়ায়, মধুর আধ আধ ভাষায় শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে, তখন হৃদয়ের প্রেম ও আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা তাঁহাদের দায়িত্ব ভারের গুরুত্ব ক্রমশঃই

উপলব্ধি করেন। বিধাতা যে নিম্নলিখিত শুভ পবিত্র ফুলটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ নর্যাদা রক্ষা করা—তাহাকে ফুলেরই মত সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা,—তাহাকে মনুষ্যজ্ঞের গৌরবে গৌরবান্বিত করা, একমাত্র তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করে। বিধাতার বাগানের এই শুভ ফুলটি যদি ধরণীর ধূলয় কলঙ্কিত হয়, তবে তাহার জন্ত পিতামাতাই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। শিশুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পিতামাতার চিন্তাই এইরূপ গুরুতর চিন্তায় আলোড়িত হয়। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভার বিধাতা তাঁহাদেরই হস্তে রাখিয়াছেন।

শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে শারীরিক উন্নতির উপরই নির্ভর করে। সুতরাং সর্বপ্রথমে শিশুর শারীরিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক পিতামাতারই কর্তব্য। কারণ শিশু সুস্থ, সবল হইয়া

বাচিয়া উঠিলে তবে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভাবনা ভাবিবার সময় আসে। অজ্ঞানতা বশতঃ উপযুক্ত যত্নের অভাবে অল্পেই জীবন নষ্ট হইলে, সকল আশাই বিফল হইয়া যায়। সুতরাং শিশু জন্মিবার পূর্বে হইতেই তাহার মাতাকে কত নিয়মোপাধিকিতে হয় এবং জন্মগ্রহণের পর শিশুকে কত বুদ্ধি বিবেচনার সহিত লালন পালন করিতে হয়—তাহা প্রত্যেক রমণীর জ্ঞান আবশ্য কর্তব্য। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার মাত্র তাহারই ক্ষুদ্র জীবনটির সহিত মাতার সকল সুখ-দুঃখ—আশা-নিরাশা অটুট বন্ধনে জড়িত হইয়া যায়। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম না জানায় অকালে কত গৃহ শূন্য হইয়া যায়, কত নারীর জীবন হাহাকারময় হয়—তাহার সংখ্যা করা যায় না।

বহুল্পলে শুধু একটু জ্ঞানের অভাবে এই ভীষণ দৃশ্য আমাদেরকে দেখিতে হয়। নারীদিগের এ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকিলে আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে নারীগণের মূর্খতা বশতঃ কত শিশু অকালে জীবন বিসর্জন করে। সুতরাং প্রত্যেক নারীর জ্ঞান লাভ করা উচিত। আমাদের দেশের অনেক লোক নারীর শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, যে, তাহারা ত আর চাকরী করিবে না, যে অধিক লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন। লেখাপড়া যে শুধু চাকরীর জন্তই প্রয়োজন তাহা নহে। নারীদিগকে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিতে হয়—তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে সমুচিত জ্ঞান লাভের

একান্তই প্রয়োজন। সামান্য চিঠিপত্র লিখিতে এবং ধোপার ও বাজার হিসাব রাখিতে বতর্টুকু জ্ঞানের আবশ্যক, এই গুরুতর দায়িত্ব ভার উপযুক্তরূপে নির্বাহ করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

একে আমাদের দেশের নারীদিগের জ্ঞান-ভাব, তত্পরি বাল্যবিবাহ বশতঃ নারীগণ এত অল্প বয়সে শিশুর জননী হন যে তখন তাহা-দিগের নিজেদের ভার লইতেই তাঁহারা অক্ষম। একটি ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের ভার লওয়া তাঁহাদের সাধ্যাতীত। তাহাকে উপযুক্ত রূপে লালন পালন করিতে হইলে যে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—তাহা তাঁহাদের মোটেই থাকে না।

কেবল সন্তানকে জন্ম দিলেই জননীর কাজ সম্পন্ন হয় না,—তাহাকে সুস্থ, সবল, কর্মঠ, বীৰ্য্যশালী মানুষ করিয়া গঠন করাই জননীর কর্তব্য কর্ম। নারী যতদিন না সেই উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন, শিশু পালনের গুরুতর দায়িত্বের মর্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হন, ততদিন তাঁহাদিগকে শিশুর জননী পদ লাভের অধিকার প্রদান করা ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ। জ্ঞানহীন নারীদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া ঘরে ঘরে আমরা যে কি সর্বনাশের বীজ রোপণ করিতেছি, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তবে বহু পূর্বে হইতে এ কুপ্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম। তাহা হইলে আজ দেশের মুখশ্রীও ফিরিয়া যাইত। স্বাস্থ্যসম্পন্ন সুদৃঢ় মাংসপেশীবিশিষ্ট, উৎসাহী, তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়-কর্মী সন্তান দেশকে প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। সমগ্র দেশ দুর্বল, রুগ্ন,

ক্ষীণজীবী, অসুস্থ, উৎসাহহীন, ভীত অমানুষে
ভরিয়া গিয়াছে।

পরিণত বয়সে কোনো কারণ বশতঃ
অসময়ে অপুষ্ট সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও
তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা যত অধিক, অপরিণত
বয়সের সন্তানের তেমন নহে। পরিণত বয়স্কা
শিক্ষিতা নারী অসময়ে প্রসূত, অপুষ্ট সন্তানকে
বাঁচাইবার জন্ত যত নিয়ম প্রণালী অবলম্বন
করিতে পারেন, সর্ব প্রকার শিক্ষাবিজ্ঞান
একটি জ্ঞানহীন অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে তাহা
অসম্ভব। সুস্থ, বলশালী সন্তান গড়িয়া তোলা
বর্তমান সময়ে নানা কারণে এক কঠিন সমস্যার
পরিণত হইয়াছে। দেশের নারীজাতির মধ্যে
যদি জ্ঞানের প্রচার থাকিত, তবে এই সমস্যা বহু
পরিমাণে মীমাংসিত হইতে পারিত। সুতরাং
এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও জীশিক্ষার বিশেষ
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র দেশে স্ত্রী-
শিক্ষার বিস্তার হইলে, দেশের শিশু মৃত্যুর হার
অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এমন অনেক
পীড়ায় আমাদের দেশের শিশুদের মৃত্যু হয়—
যাহা শিক্ষিতা জননী হইলে অনেক স্থলেই
নিবারণ করিতে সক্ষম হন।

কলিকাতা মহরে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অতি
ভয়ানক। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য-
বিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কলি-
কাতায় এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক প্রতি চারিটি
শিশুর মধ্যে একটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দশ
বার, বৎসর পূর্বে ইহা অপেক্ষাও অবস্থা
শোচনীয় ছিল। তখন প্রতি চারিজনের মধ্যে
দুইজনেরই মৃত্যু হইত। কলিকাতার বিভিন্ন
ওয়ার্ডের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা তুলনা করিয়া
দেখিলে দেখা যায় যে, যে সকল ওয়ার্ডে ঘন
বসতি এবং গৃহগুলি অপরিষ্কার আবর্জনাগূর্ণ,

আলো বাতাসশূন্য সেই সকল ওয়ার্ডেই শিশু
মৃত্যুর সংখ্যা অধিক।

১৯১৪—১৯১৫ সনে জোড়াবাগান বড়
বাজার এবং কলিঙ্গাতে প্রতি হাজারে ৪৪০
জন, কুমারটুলী, বড়টোলা, সুকিয়া ষ্ট্রীট,
গদগুরু ২৪০ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে
কিন্তু ভবানীপুরে প্রতি হাজারে ১৯৪ জন
শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৮ সনের রিপোর্ট
হইতে দেখা যায় যে, জোড়াবাগানে হাজার
করা ৫৮১, বড় বাজারে ৪৭৬, বহুবাজারে
৪৭৮, কলিঙ্গায় ৩৬৬, খিদিরপুরে ৩৫১, মুচি-
পাড়ায় ৩৪৫ ও ফেনিক বাজারে ৩২৫ জন
শিশু মারা গিয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র দেশ
সমূহে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া
বাইতেছে। আর আমাদের এই ছর্ভাগ্য দেশে
শিশু মৃত্যু ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। জোড়া
বাগান, বড় বাজার প্রভৃতি স্থানেই মৃত্যু
সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। এই সকল স্থানে
ঘন বসতি, গৃহগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং
অস্বাস্থ্যকর। বাড়ী গুলি সব ছোট ছোট
অসংখ্য কুঠুরীতে বিভক্ত। প্রত্যেক কুঠুরীতে
এক এক পরিবারে বাস করে। অধিকাংশ
কুঠুরীই সম্পূর্ণরূপে আলো ও বাতাস বর্জিত।
সহরের এই অংশে বহু সংখ্যক মূর্থ, কুসংস্কার-
প্রিয় এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল লোক সকল
বাস করে। ইহাদিগের চির পুরাতন রীতি-
নীতি এবং আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে
গেলে ইহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে।
ইহাদের গৃহে কোন প্রকার সংস্কার সাধন
করা দুঃসাধ্য। ভবানীপুরের বাসগৃহগুলি
খোলা জায়গায় অবস্থিত, তেমন ঘন বসতি
নাই, সেই কারণে শিশু মৃত্যুর সংখ্যাও কম।

১৯১৪—১৯১৫ সনে যত শিশু জন্মগ্রহণ

RARE BOOK 3944
31/8/09

করে, তাহার তিন ভাগের একভাগ জন্মবার প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃত্যুর প্রধান কারণ—অপুষ্ট অবস্থায়, অসময়ে জন্ম এবং ধুন্তকার। শোষোক্ত কারণে মৃত্যু সচরাচর অজ্ঞানতাবশতঃ এবং মূর্খ ধাত্রীদিগের জ্ঞানই ঘটয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুইটি কারণে মৃত্যু—লোকের আর্থিক এবং সামাজিক কারণে ঘটে। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বায়্যাবিবাহ এবং অবরোধ প্রবাহই প্রধানতঃ এই সকল মৃত্যুর কারণ। এই কারণগুলির এক একটিই এত গুরুতর যে, বাহির হইতে তাহার সংস্কার সাধন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষা প্রচারই এই সকল গুরুতর কারণ দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়। জনসাধারণ এবং নারীগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারিত হইলে উপরোক্ত কারণগুলি তাঁহারা নিজেরাই সংশোধন করিতে পারিবেন।

প্রথম সপ্তাহ : কাল্পি গেলো মৃত্যু সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। প্রথম সপ্তাহে যত মৃত্যু হয়, প্রথম মাসের শেষে মৃত্যু সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক হয়। প্রথম মাসে ধুন্তকারেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয়, তা'রপর ব্রুইটিস। শিশুদের শারীরিক যত্নাদি এত কোমল থাকে যে, হঠাৎ শীতাতপের পরিবর্তন তাহারা সহ করিতে পারে না। দরিদ্রতাবশতঃ আমাদের দেশের লোকেরা উপযুক্ত বস্ত্রদ্বারা শিশুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে অসমর্থ। এই কারণে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুদের ব্রুইটিস এবং নিউমোনিয়া হয়।

নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে ১৯১৪-১৫ শিশুগণের কোন্ পীড়ায় কত মনে হারে মৃত্যু হইয়াছে তাহা উপলব্ধি হইবে।

গরত ১ম। বসন্ত রোগের প্রকৃতি সাধারণতঃ মৃত্যু হার ১০%। শতকরা ৪-৪। ১ম জ্বর ম্যালেরিয়া পেটের অসুখ শতকরা ৮-১। ২ম কলেরা আমাশয় ৩। অসময়ে জন্ম ৩। অপুষ্ট অবস্থায় জন্ম (Debility at Birth) শতকরা ৩১-৮। ক্ষয়রোগ (Marasmus) ৪। ব্রুইটিস ৫। নিউমোনিয়া ৬। ধুন্তকার (Tetanus) neonatorum ৬। লিভার ৬-২।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে শতকরা ৮০টি শিশুর মৃত্যু তিনটি প্রধান কারণে ঘটয়াছে। যেমন অকালে এবং দুর্বল অবস্থায় জন্ম, ব্রুইটিস ও নিউমোনিয়া এবং ধুন্তকার ও তড়কা। আমাদের দেশের নারীজাতি যদি শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান আলোকিত যুগের এমন অনেক নিয়ম প্রণালী ও উপায় সকল অবগত থাকিতেন, যদ্বারা তাঁহারা দুর্বল, অকালে প্রসূত শিশুদিগের অধিকাংশকেই রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু জননীগণ মূর্খ বলিয়া এ সকল

নিয়ম প্রণালীর কিছুই জানেন না, স্ত্রতরাং কত শিশু শুধু মাতার অজ্ঞতা বশতঃ প্রাণত্যাগ করে! আমাদের গ্রীষ্মাধিক্য দেশে উপযুক্ত যত্ন লইলে, ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়ার জন্ম শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা সহজেই হ্রাস করা যাইতে পারে। মাতা শিক্ষিতা হইলে ধনুষ্ঠকারে শিশুদিগের মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারেন। এই সুসভ্য যুগে আমাদের দেশে মূর্খ ধাইদিগের হস্তে শিশুর জন্মকালের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ধনুষ্ঠকারে তাহার মৃত্যু ঘটান আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে। মূর্খ ধাইদিগের পক্ষে এই কার্যের ভার লওয়া আইন বিরুদ্ধ বলিয়া দণ্ডনীয় হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে মাতার জ্ঞান থাকিলে তিনি ধাত্রীদিগকে নানা বিষয়ে সতর্ক করিতে এবং উপদেশ দিতে পারেন। নারীজাতি শিক্ষালাভ করিলে, শারীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বর্তমান যুগের বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিশুপালন প্রণালী অবগত হইয়া স্বস্থ, সবল, বুদ্ধিমান, তেজস্বী সন্তান গঠন করিতে পারিবেন।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে শিশুশিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল দেখা যাইতেছে। অতি অল্প বয়সেই বালক বালিকাগণের বুদ্ধিবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইতেছে এবং তাহার নানা ভাষায় এবং অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহে এখনো সেই মাক্কাতার আমলে “অ, আ-ক, খ” এবং A B C মুখস্ত করাইয়া পাঠশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের নারীগণ যদি শিক্ষিতা হইতেন, তবে কোমল মতি সন্তানদিগকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয়ের কঠোর ও একবর্ষে শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া

না দিয়া, নিজেরাই বর্তমান চিত্তাকর্ষক ও উন্নত প্রণালীতে তাহাদিগকে সুন্দর রূপে শিক্ষা দিতে পারিতেন। মাতার নিকট যে শিক্ষা শিশু কোমল বয়সে পায়, তাহা যেমন তাহার মনে দৃঢ়রূপে আঁকিত হইয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। স্ত্রতরাং মাতার হস্তে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা নির্ভর করে, তেমনি তাহার মানসিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষও তাহার হস্তে গুপ্ত। স্ত্রতরাং দেখা যাইতেছে যে, নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারই দেশের সর্বোদীন উন্নতির প্রধান উপায়।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতার অন্তঃপুর পরিদর্শন করিবার জন্য একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি তাহার কার্য বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—“যতই দেশে শিক্ষার প্রচার হইতেছে, নারীদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজন ততই উপলব্ধি হইতেছে। মূর্খ এবং অর্ধ শিক্ষিতাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও শিক্ষিতা-দিগের মধ্যেও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানভাব দেখা যায়। আমি এক বৎসরের মধ্যে ৩৬৬৬টি বাড়ী পরিদর্শন করিয়াছি। ইহাতে ৬৭৪০টি পুথক পরিবারকে বাস করিতে দেখিয়াছি। ৬৭৪০ জন স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্তা বলিয়া সন্তান পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছি। ৫৪৫টি নবজাত শিশু দেখিয়া যথাযথ সাহায্য এবং তাহাদিগকে পালন করা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। শিশুর জন্মগ্রহণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যদি উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয়, তবে বিপদ অনেকটা কাটিয়া যায়। ২৪০টি বিনা টিকা দেওয়া শিশু দেখিয়া তখনই কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়াছি, গৃহের নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়া তাহা দূর করিবার

জন্ম হেল্‌থ অফিসারকে জানাইয়াছি। কলিকাতার মত বৃহৎ সহরে আমার মত আরো অনেক পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইলে, তবে কিছু কাজের আশা করা যাইতে পারে।” ইনি শিক্ষিতা ধাইদিগকে লইয়া ক্লাস করিয়া তাহাদিগকে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন এবং প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত সহরের জন্ম এইরূপ পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইলে প্রকৃতই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

শিশুপালন, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম এবং খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা জনিতই এত অমূল্য জীবনের অপচয় হয়। তাহা নিবারণ করিতে হইলে প্রত্যেক নারীরই শিক্ষা লাভ করা এবং এই গুরুতর কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা কর্তব্য। আমাদের নারীগণ যাহাতে শিশুপালনের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ প্রণালী, শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য নিয়ম অবগত হইয়া শিশুপালনে সাহায্য লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিলে—উপযুক্ত বস্ত্র পরাইলে এবং খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করিলে, মোটামুটি শিশুকে সুস্থ রাখা যায়। সাধারণ ভাবে শিশুদিগের অসুস্থতার কারণ জানা থাকিলে জননীরা সেই সব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক তাহাদিগকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিতে পারেন। পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর নিয়ম ও শারীরতত্ত্ব জানা থাকিলে জননীগণ হ্রস্ব এবং রুগ শিশুকেও সুস্থ, সবল ও তেজস্বী সম্ভানে পরিণত করিতে

সক্ষম হন। কিন্তু এ সব বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে নানা প্রকার বন্ধাট ও বাতনা ভোগ করিতে হয়, এমন কি শিশুর প্রাণ পর্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে।

আমাদের দেশের প্রাচীনাগণ বহুদর্শিতার ফলে শিশুপালন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন সাধারণতঃ শিশুদিগের যে সকল পীড়া হয়, তাহার সুন্দর মুষ্টিযোগ তাঁহাদের জানা ছিল। তদ্বারা তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই শিশুদিগের রোগ আরাম করিতেন। বর্তমান সময়ে সেই সব প্রাচীন মহিলাদিগের অধিকাংশই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কন্যা ও বধূগণের সে অভিজ্ঞতা নাই এবং অনেক মুষ্টিযোগ ও তাঁহাদের সহিত লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে নানা কারণে একাদিক্রমে পরিবার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বর্তমান সময়ে নারীদিগকে অধিকাংশ স্থলে একাকী সংসার করিতে হয়। সুতরাং বয়োবৃদ্ধা অভিভাবিকা সঙ্গে না থাকায় নিজেদেরই শিশু পালনের সমস্ত ভার লইতে হয়। সুতরাং মুখ হইয়া থাকিলে শিশুপালন লইয়া অত্যন্ত বিপদের মধ্যে পড়িতে হয়। কিন্তু শিক্ষা থাকিলে এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ই জানা থাকে এবং একাকী হইলেও সূচাঙ্গরূপে বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালীতে শিশু পালন করিতে সমর্থ হন।

শিশু পালনের বিষয় বুঝাইতে হইলে সর্ব প্রথমে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত বিবেচনায় আমরা আগামীবারে উহারই আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ।

পূর্বে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বহু রোগের চিকিৎসা হইত। এক্ষণে আয়ুর্বেদোক্ত ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ নূপ্তপ্রায়। অর্শ প্রভৃতি রোগে সম্প্রদায় বিশেষকে ক্ষার প্রয়োগ করিতে দেখা যায় মাত্র। ক্ষারের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত 'অসম্পূর্ণ'। আমরা এই প্রবন্ধে পাঠকগণের অবগতির জন্ত ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্ষার, অগ্নি, জলোকা প্রভৃতি শাস্ত্রে অম্ল-শব্দ নামে আখ্যাত। ইহারা হীনশব্দ বা শব্দের জায় কার্যকারী বলিয়া ইহাদিগকে অম্লশব্দ বলা যায়। শব্দ এবং অম্লশব্দের মধ্যে ক্ষারই প্রধানতম। কারণ ইহা দ্বারা ছেদন (কাটিয়া ফেলা—যেমন অর্শের বলি ক্ষারযুক্ত সূত্রের দ্বারা বাধিয়া রাখিলে কাটিয়া যায়) ভেদন (যেমন ফোড়ায় ক্ষার লাগাইলে বিদীর্ণ হয়) লেখন (কাটিয়া ফেলা—যেমন ক্ষত প্রভৃতির দূষিত অংশ পরিষ্কার করা) এই ত্রিবিধ কার্য্যই হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নি বা জলোকা দ্বারা ছেদন কার্য্য হয় না। আবার ইহা ত্রিদোষ নাশক এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে (যেমন পিত্তজ অর্শ নাশক জন্ত) উপযোগী।

দূষিত ত্বক মাংসাদি ক্ষরণ অর্থাৎ পাতন অর্থাৎ নাশ করে বলিয়া ইহাকে ক্ষার বলা যায়। ক্ষার—বিবিধ ঔষধ সংযোগে ত্রিদোষনাশক এবং শ্বেতবর্ণ বলিয়া সৌম্য অর্থাৎ শীতল গুণ বিশিষ্ট। কিন্তু ক্ষার শীতল গুণ বিশিষ্ট হইলেও উহাতে দহন (দগ্ধ করা) পচন (পাকাইয়া ফেলা) দারণ (বিদীর্ণ

করা) শক্তি থাকা অবিরুদ্ধ। ক্ষার—প্রচুর আয়ুর্বেদ ঔষধ সংযুক্ত হওয়ার কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, পাটন, বিলয়ন (মিলাইয়া দেওয়া—যেমন বাত-কফ প্রধান শোথ ক্ষার সেবনে মিলাইয়া যায়) শোধন (ক্ষতাদি বিসৃদ্ধ করে), স্তম্ভন (রক্তপাত বন্ধ করে) লেখন গুণ বিশিষ্ট এবং ক্রিমি, আম, কুষ্ঠ, বিষ, মেদ প্রভৃতি ও অতিসেবিত হইলে পুরুষায় নষ্ট করে।

প্রতিসারণীয় (লাগাইবার) এবং পানীয় (খাইবার) ভেদে ক্ষার দুই প্রকার। কুষ্ঠ, ক্রিটম, (কুষ্ঠ বিশেষ), দক্ষ, বিলাস (অরুণ বর্ণ ধবল রোগ), মণ্ডল নামক কুষ্ঠ, ভগনর, দূষিত ক্ষত, নালীয়া, আঁচিল, তিল, ছুলী, মেচেতা, আঁচিলভেদ, বাহু বিজ্রমি (বড় ফোড়া) বাহু ক্রিমি (উকুন), বাহুবিষ (বিষাক্ত ক্ষত প্রভৃতি) অর্শ এবং উপজিহ্বা, অবিজিহ্বা, উপকুশ, দন্ত বৈরদর্ভ এবং তিনপ্রকার রোহিণী—এই সকল রোগে প্রতিসারণীয় ক্ষার প্রয়োজ্য।

পানীয় ক্ষার ক্রিটম বিষ বা দুধীবিষ, গুল্ম, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা (সুন্দর পাথরী) পাথরী, অভ্যন্তর বিজ্রমি, ক্রিমি ও বিষ এবং অর্শ রোগে প্রয়োজ্য। রক্তপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, প্রকৃতি, বাসক, বৃদ্ধ, দ্রবল, ভ্রমরোগগ্রস্ত, মদরোগগ্রস্ত, মূর্ছা রোগগ্রস্ত, তিমির নামক চক্ষুরোগগ্রস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিকে পানীয় ক্ষার প্রয়োগ করিবে না।

প্রতিসারণীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়। বিবিধ রোগ প্রসঙ্গে পানীয় ক্ষারের

বিষয় উল্লিখিত হইবে বলিয়া এ স্থানে বলা হইল না।

প্রতিসারনীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, শরৎকালে প্রশস্ত দিনে পর্বতের সাহুদেশে-জাত, মধ্যবয়স্ক, বৃহদাকার এবং দাবাগ্নি বিষের দ্বারা অদূষিত ঘণ্টাপাকুল গাছকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। অনন্তর বায়ুশূন্য স্থানে রাখিয়া, উহার সহিত সূক্ষ্ম শর্করা (চূণ প্রস্তুত করিবার পাথর) মিশ্রিত করিয়া তিলের ভাঁটার দ্বারা দণ্ড করিবে। অনন্তর অগ্নি নির্বাপিত হইলে ঘণ্টাপাকুলের ভস্ম এবং পাষণ ভস্ম পৃথক পৃথক গ্রহণ করিবে।

অনন্তর কুড়চি, পলাশ, অম্বকর্ণ (লতাশাক), পালতে মাদার (মতান্তরে দেবদারু) বহেড়া, সোঁদাল, ডহরকরঞ্জ, বাসক, কদলী, পটিয়া, লোধ, আকন্দ, মনসাসীজ, আপাং, পারুল, রক্তচিটা, নাট্যকরঞ্জ, ইন্দ্র বৃক্ষ (কুড়চি ভেদ) অনন্তমূল, হাপরমালি, করবী, ছাতিম, গণিয়ারী, কঁচ এবং চারি প্রকার ধোঁধা (বৃহৎ ফলা, অল্প ফলা, পীতপুষ্প ও স্বেত পুষ্প) ইহাদিগের ফল, মূল, পত্র ও শাখা পূর্বোক্ত রূপে অগ্নি দ্বারা দণ্ড করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে।

পরে ঘণ্টাপাকুলের ভস্ম ছই ভাগ এবং কুড়চি প্রভতির ভস্ম একভাগ করিয়া—সমুদায়ে বত্রিশ সের লইবে এবং ১৯২ সের জল বা গোমুত্রে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সিতে বাদ দিয়া ক্ষারজল বৃহৎ কটাহে রাখিয়া অগ্নিতে পাক করিবে এবং হাতা দিমা ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকিবে। পাক করিতে করিতে যখন বেশ নিম্নল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হইবে,

আধিন—৪

তখন নামাইয়া বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া পুনরায় সিতে বাদ দিবে। অনন্তর দেড় সের ক্ষারজল পৃথক রাখিয়া, অবশিষ্ট অংশ পুনরায় পাক করিবে এবং নাটা, পূর্বোক্ত পাথর ভস্ম, রিহুক এবং শঙ্খনাভি প্রত্যেকে এক সের—মোট চার সের; লৌহপাত্রে উত্তপ্ত করিয়া অগ্নিবর্ণ হইলে নামাইয়া স্বতন্ত্র রক্ষিত দেড় সের জলে ভিজাইয়া ও বাটিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। সাবধানতার সহিত নাড়িতে নাড়িতে যখন এমন হইবে যে, অত্যন্ত ঘন বা তরল নহে—তখন নামাইয়া একটি লৌহ-কলসের মধ্যে রাখিবে এবং মুখ বন্ধ করিয়া নির্জন স্থানে রক্ষা করিবে।

তীক্ষ্ণ বীৰ্য, মধ্য বীৰ্য এবং মৃদুবীৰ্য ভেদে ক্ষার তিন প্রকার। উপরে যে ক্ষার প্রস্তুতের কথা বলা হইল—উহা মধ্যবীৰ্য ক্ষার। উক্ত ক্ষারে বস্ত্রপি নাটা প্রভতি দ্রব্য চতুষ্টয় না দেওয়া হয়, তবে তাহাকে মৃদুবীৰ্য ক্ষার বলে। আবার উক্ত ক্ষারে যদি দস্তী, দ্রবস্তী (দস্তীভেদ), রক্ত চিটা, গণিয়ারী, নাট্যকরঞ্জের পত্র, তালমূলী, বিটলবণ, সাচি-ক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী (সোনামুখী, মতান্তরে কঙ্কুট নামক মণিকা) হিং, বচ, ও মিঠা বিষ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করা হয়, তবে তাহাকে তীক্ষ্ণ ক্ষার বলে।

ক্ষার দীর্ঘকাল প্রস্তুত থাকার জন্য অথবা হীনবীৰ্য ওষধ দ্বারা প্রস্তুত হওয়ার জন্য বীৰ্য হীন হইলে পূর্বোক্ত ক্ষার জলের সহিত পুনরায় পাক করিয়া লইলে বীৰ্যবান হয়।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা মৃদু নয়—অত্যন্ত গুরুবর্ণ নয়—শুদ্ধ অর্থাৎ করকরে নয়, পিচ্ছিল, অভিব্যন্দী নয় অর্থাৎ প্রয়োগ করিলে ছড়াইয়া পড়ে

• •

না, অত্যন্ত তরল বা ঘন নয় এবং শীঘ্রকার্যকারী—এই আটটা গুণ বিশিষ্ট ক্ষারই উত্তম। অত্যন্ত মুদ্র, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত পিচ্ছিল, অত্যন্ত প্রসর্পণকারী (ছড়াইয়া পড়ে) অত্যন্ত গাঢ় সম্পূর্ণরূপে পাক করা নয় এবং হীনদ্রবতা অর্থাৎ কথিত দ্রব্য সমস্ত না দেওয়া—এই নয়টা ক্ষারের দোষ।

ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে—রোগীকে বায়ু ও আতপ শূন্য প্রশস্ত স্থানে উপবেশন করাইয়া ব্যাধিস্থান উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া, পিস্তুহুই হইলে সেই স্থান ঘর্ষণ করিয়া, বাতহুই হইলে কঠিন অসাড় চর্মের অন্ন ছাল তুলিয়া এবং ককহুই ও শোথযুক্ত স্থানে অন্ন অন্ন চিরিয়া, শলাকা দ্বারা ক্ষার প্রয়োগ করিবে। অনন্তর একশত বায়ু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে—ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষার তুলিয়া ফেলিবে। ক্ষার প্রয়োগের পর পীড়িত স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইলে—সম্যকরূপে দগ্ধ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ক্ষারদগ্ধ স্থানে আলা উপস্থিত হইলে—ঘৃত, মধু এবং কাঁজি প্রভৃতি অম্লদ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আলা নষ্ট হয়।

ক্ষার দগ্ধ স্থানের ক্ষত পূরণ করিবার জন্ত তিল ও যষ্টিমধু—তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য অম্লরসে বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে শীঘ্রই ক্ষতস্থান পুরিয়া উঠে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ক্ষারের তেজ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য, সুতরাং অগ্নিগুণ বিশিষ্ট কাঙ্জিকাদি দ্বারা কি করিয়া যন্ত্রণা প্রশমিত হইতে পারে? কিন্তু ক্ষারে অম্লরস ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রসই আছে। আবার তন্মধ্যে কটু ও লবণ রসই প্রচুর রূপে বর্তমান।

এইজন্ত অম্লরসের সহিত সংযুক্ত সেই তীক্ষ্ণ লবণ রস—তীক্ষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই হেতু ক্ষার জনিত জ্বালারও হ্রাস হয়।

ব্যাধি স্থান ক্ষার দ্বারা সম্যক রূপে দগ্ধ হইলে—রোগের উপশম, ব্যাধি স্থানের লবুতা এবং দগ্ধ স্থান হইতে শ্রাব নির্গম বোধ হয়। যদি সম্যক দগ্ধ না হইয়া কম দগ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্যাধি স্থানে বেদনা, কণ্ডু ও জড়তা হয় এবং রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে জ্বালা, রক্তবর্ণতা, পাকিয়া যাওয়া, অঙ্গবেদনা, গ্লানি, পিপাসা, মুচ্ছা—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

দুর্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীক, সর্বাঙ্গ শোথ বিশিষ্ট রোগী, উদর রোগী, রক্তপিত্ত রোগী, গর্ভিণী নারী, ঋতুমতী স্ত্রী, জ্বররোগী, প্রমেহ রোগী, উরঃক্ষত বশতঃ ক্ষীণ রোগী, তৃষ্ণা ও মুচ্ছাপীড়িত ব্যক্তি, ক্ষীণশুক্ৰব্যক্তি, যে সকল রোগীর অণ্ড বা যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত বা নিম্নদিকে প্রসৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগের পক্ষে উভয়বিধ ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মস্ত, শিরা, ঝায়, সন্ধি সকল, তরুণাঙ্ঘ্রি (cartilage) সিবন (সেলাই) করার মত, ধমনী (Nerve) গলদেশ, নাভি, লিঙ্গ নালশ্রোতঃ, অন্ন মাংস বিশিষ্ট স্থান, এবং বস্মগত চক্ষুরোগ ভিন্ন ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। পূর্বে যে সকল ক্ষারসাধ্য ব্যাধির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে শোথ থাকিলে, অস্থি শূল থাকিলে, অন্নপানে ঘেষ থাকিলে এবং হৃদয় ও সন্ধি স্থানের পীড়া থাকিলে, ক্ষার প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

অন্ন বৃদ্ধি ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হইলে, ক্ষার

বিষ, অগ্নি, শত্রু এবং বজ্রের হায় প্রাণনাশক হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হইলে সর্বত্রই ঘোরতর রোগ সকল বিনষ্ট করে ।

অগ্নিকর্ম বিধি ।

শুণে ক্ষার শ্রেষ্ঠ হইলেও, কার্যতঃ ক্ষার হইতে অগ্নি শ্রেষ্ঠ । কারণ অগ্নিকর্ম দ্বারা রোগ প্রশমিত হইলে আর তাহাদের পুনরুৎপত্তি হয় না এবং যে সকল রোগ গুণ্ড, শত্রু ও ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা নিবারিত হয় না, তাহারা অগ্নিকর্ম দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে ।

অগ্নি কর্মের জন্ত নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যথা, পিঁপুল, ছাগবিষ্ঠা, গরুর দাঁত, শর, শলাকা, জাম্ববোষ্ঠ (জামের হায় মুখাগ্র বিশিষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত বর্তি), লোহ, তাম্র, রৌপ্য, মধু, গুড় ও শ্বেদ দ্রব্যাদি (দ্রুত তৈলাদি) তন্মধ্যে পিঁপুল, ছাগলনাদী, গোদন্ত, শর ও শলাকা চর্মাশ্রিত রোগে, জাম্ববোষ্ঠ ও লোহ তাম্রাদি মাংসগত রোগে এবং মধু ও শ্বেদ পদার্থ শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত ও অস্থিগত রোগে অগ্নি কর্মের জন্ত প্রয়োগ করিতে হয় ।

শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অস্ত্র সকল ঋতুতেই অগ্নিকর্ম করা যাইতে পারে । কিন্তু শরৎ এবং গ্রীষ্মকালে যদি অগ্নিসাধ্য ব্যাধি প্রাণ নাশক হইয়া উঠে, তাহা হইলে উষ্ণ কালের বিপরীত বিধান । অর্থাৎ শীতল আচ্ছাদন, ভোজন, প্রলেপ অবলম্বন করিয়া উত্তম ছই ঋতুতেই অগ্নি কর্ম করিতে পারা যায় । সকল রোগে এবং সকল ঋতুতেই পিচ্ছিল (দধি প্রভৃতি যুক্ত) অন্ন ভোজন

করাইয়া অগ্নি কার্য্য করিবে । কিন্তু মৃদুগর্ত (Difficult labour), পাথরী, ভগন্দর, অর্শ ও মুখরোগে রোগীকে ভোজন না করাইয়া অগ্নিকর্ম করা কর্তব্য ।

কেহ কেহ বলেন যে, স্বকৃ দধি ও মাংস দধি ভেদে অগ্নিকর্ম দুই প্রকার । কিন্তু ধনন্তরির মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থিতেও অগ্নিকর্ম করা নিষিদ্ধ নহে ।

অগ্নিকর্ম দ্বারা স্বকৃ দধি হইলে শব্দ, হর্গন্ধ ও চর্ম্মের সঙ্কোচ হয় । মাংস দধি হইলে কপোত বর্ণতা (মলিন শ্বেতবর্ণ) অন্ন ফোলা এবং শুষ্ক ও সঙ্কুচিত ক্ষত হয় । শিরা ও স্নায়ু দধি হইলে কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ক্ষত হয় এবং রক্তাদির স্রাব বন্ধ হয় । সন্ধি এবং অস্থি দধি হইলে রুদ্ধ, অরুণ বর্ণ, এবং কর্কশ ও স্থির (ব্যাপ্তিশীল নহে) ক্ষত হয় ।

শিরোরোগ ও অধিমহ নামক চক্ষুরোগে ভ্রু, কপাল ও শজ্য দেশে, বর্ষা অর্থাৎ চক্ষুর পাতার রোগে দৃষ্টি স্থান আর্দ্র আলতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বর্ষা দেশের রোমকূপ দধি করিতে হয় । স্বকৃ, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে বায়ু প্রকোপ বশতঃ অত্যন্ত বেদনা হইলে, উন্নত ও অসাড় কঠিন মাংসে, ব্রণে, গ্রন্থি, অর্শ, অর্কবৃন্দ, ভগন্দর, অপটী, গোদ, আঁচিল তিল, অস্ত্রবৃদ্ধি (Hernia), সন্ধিহান ও শিরোচ্ছিন্ন হইলে, নালী বা প্রভৃতি রোগে এবং অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে অগ্নিকর্ম করিতে হয় । রোগের স্থানভেদে অগ্নিকর্ম চার প্রকার । যথা, বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতীসারণ । আঁক, গলগণ্ড প্রভৃতি দৃঢ়মূল রোগে বালার হায় আকারে দধি করাকে বলয়, তিল, আঁচিল প্রভৃতি রোগে বিন্দুর আকারে দধি করাকে বিন্দু, তির্য্যাক, সরস

ও বক্রাদিভেদে নানা আকারে দগ্ধ করাকে বিলেখন এবং উত্তপ্ত লোহ শলাকা দ্বারা ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ বলে। অগ্নিকর্ষ এই চারি প্রকার বলা হইল। রোগের সংস্থান অর্থাৎ আয়তনাদি, মর্দনস্থান (পরিহারের জন্ত) রোগীর বলাবল, ব্যাধি (বাতকফ জনিত ব্যাধিতে অগ্নিকর্ষ কর্তব্য এবং রক্তপিত্তে নিষিদ্ধ), ইহা ভিন্ন ঋতুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্নিকর্ষ করিতে হয়।

অগ্নিদ্বারা সম্যক্ দগ্ধ হইলে মধু ও ঘৃত সেই স্থানে মর্দন বা লেপন করিবে।

পিত্ত প্রকৃতি, অস্তঃ শোণিত (যাহাদের শরীরের অভ্যন্তরে কোন স্থানে রক্তস্রাব হয়), ভিন্ন কোষ্ঠ (যাহাদের কোষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, যাহাদের শরীরে শল্য বিদ্ধ আছে, দুর্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীক, অনেক ক্ষতযুক্ত এবং পাণ্ডু রোগী, মেহ রোগী, রক্তপিত্ত রোগী তৃষ্ণার্ত প্রভৃতি যাহাদিগকে স্বেদের অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে অগ্নি কর্ষ নিষিদ্ধ।

এক্ষণে চিকিৎসক কর্তৃক দগ্ধ করা ব্যতীত অন্য প্রকারে অর্থাৎ প্রমাদ বশতঃ দগ্ধের লক্ষণ বলা যাইতেছে। অগ্নি—ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং কাঠাদি রূক্ষ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া দগ্ধ করিয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত ঘৃত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ সহজে সূক্ষ্ম শিরা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া ত্বক্ মাংসাদিকে আশু দগ্ধ করিয়া ফেলে। এই জন্ত স্নেহ পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে অত্যন্ত অধিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

চিকিৎসকের দোষে বা প্রমাদ বশতঃ চারিপ্রকার অগ্নিদগ্ধের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—পুষ্টি, দুর্দগ্ধ, সম্যক্ দগ্ধ ও অতি দগ্ধ।

দগ্ধ স্থান বিবর্ণ, (পাণ্ডুবর্ণ), অত্যন্ত দাহযুক্ত হইলে এবং ক্ষেট (ফোসকা) উৎপন্ন না হইলে তাহাকে পুষ্টি দগ্ধ বলা যায়। দগ্ধ স্থানে ক্ষেট উৎপন্ন হইলে, চোষ (চুষণ বৎ পীড়া, দাহ, বক্তবর্ণতা, বেদনা ও পাক বিশিষ্ট হইলে এবং দীর্ঘকালে ভাল হইলে তাহাকে দুর্দগ্ধ বলে। দগ্ধস্থান অগভীর ভাবে দগ্ধ, পাকা তালের ছায় বর্ণ বিশিষ্ট, অত্যন্ত উন্নত বা অবনতরূপ দোষ বর্জিত এবং পূর্বে ত্বক্ মাংসাদি দগ্ধের যেকোন লক্ষণ বলা হইয়াছে সেইরূপ লক্ষণ যুক্ত হইলে সম্যক্ দগ্ধ বলা যায়। আর দগ্ধ স্থানের মাংস ফুলিয়া পড়িলে, গাত্র বিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ ফাটিয়া গেলে, সিরাস, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি নষ্ট হইলে, জ্বর, দাহ, পিপাসা, তৃচ্ছা ঘটিলে তাহাকে অতিদগ্ধ বলে। ইহাতে ক্ষত স্থান বিলম্বে পূর্ণ হয় এবং ভাল হইলেও বিবর্ণ থাকে।

প্রাণীদিগের রক্ত অগ্নি সংযোগে অত্যন্ত কুপিত হইয়া এবং অগ্নি ও কুপিত রক্তের জন্ত পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ অগ্নি ও পিত্ত রস, ও বীৰ্য্য তুল্য। উভয়ের প্রকোপ বশতঃ তীব্র বেদনা হয়, বিদাহ জন্মায়, শীঘ্র ক্ষেট উৎপন্ন হয় এবং জ্বর ও তৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে।

এক্ষণে, অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে, উষ্ণ দগ্ধে অগ্নিতাপ (স্বেদ), উষ্ণ প্রলেপাদি এবং উষ্ণ অন্ন পান প্রয়োগ করিবে। কারণ শরীরে অধিক পরিমাণে স্বেদ দিলে রক্ত স্নিগ্ধ হয় বলিয়া জমাট বাধিতে পায় না। কিন্তু জল শীতল বলিয়া জল প্রয়োগ করিলে রক্ত জমাট হইয়া যায় এবং তজ্জন্ত রক্তমার্গ বায়ু শূল, শোথ ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত করে। সেইজন্য পুষ্টি দগ্ধ স্থানে উষ্ণ

ক্রিয়া করাই হিতকর। দধি স্থানে শীত ক্রিয়া করিলে তাহা কখনই সুখকর হয় না।

হৃদয়ে দাহ গভীর হইলে শ্বিত (শ্বেদ প্রাপ্ত) রক্তের উষ্ণতা দূর করিবার জন্য ক্রিয়া এবং অগভীর হইলে যাহাতে জমাট বাধিয়া না যায় তজ্জন্ত উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। পরে ঘৃত লেপন এবং শীতল দ্রব্য সেবন করিবে।

সন্ধ্যা দধি বংশলোচন, পাঁকুড় ছাল, রক্ত চন্দন, গেরীমাটি ও গুলঞ্চ সমান ভাগে লইয়া পেষণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দধি স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পিত্ত জনিত দাহাদি নিবারিত হয়। গো, অশ্ব প্রভৃতি গ্রাম্য, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি আনুপ এবং কচ্ছপাদি ঔদক মাংস বাটিয়া দধি স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত যন্ত্রণার উপশম হয়। অপিচ, পিত্তজ বিদ্রমি রোগে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, সন্ধ্যা দধি সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

অতিদধি যেসকল মাংস রুলিয়া পড়িয়াছে— সেইগুলি ফেলিয়া দিয়া শীতল ক্রিয়া করিবে। পরে সেই স্থানে শালি তণ্ডুলের চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। ক্ষতস্থান গুলঞ্চের পাতা বা পদ্ম প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অপিচ, পিত্ত বিসর্পে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, অতিদধিও সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

মোম, ষষ্টিমধু, লোধ, ধূনা, মাজুঠা, রক্ত চন্দন এবং সূচীমুখী—সমান ভাগে বাটিয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সর্বপ্রকার দধি ক্ষতের উত্তম ঔষধ।

সর্বপ্রকার মেহ দধি জনিত ক্ষত অর্থাৎ উত্তপ্ত ঘৃত তৈলাদি দ্বারা ক্ষতস্থানে রক্ষা ক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ মেহ ব্যতীত রক্ষা চূর্ণ, প্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

কণ্ঠনাসিকাদি স্থানে অগ্নি কন্ধ্য করিবার সময় ধূম লাগিয়া রোগীর কতকগুলি উপদ্রব জন্মিতে পারে। ইহাকে ধূমোপহত বলে। অগ্নি কন্ধ্য ব্যতীতও ধূম লাগিয়া পীড়া উপস্থিত হইলে তাহাকেও ধূমোপহত বলা যায়। শ্বাস হিকা, আশ্বান (পেট ফোলা), কাস, চক্ষুর দাহ ও রক্তবর্ণতা, নিঃশ্বাসের সহিত ধূম নির্গম, ধূম ব্যতীত অল্প দ্রব্যের দ্বাণ না পাওয়া, সমস্ত থাকে ধূমের আশ্বাদ (ধোয়াটে) পাওয়া, শ্রবণ শক্তির লোপ, তৃষ্ণা, দাহ, অর, অবসন্নতা ও মুচ্ছা—ধূমোপহত ব্যক্তির এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

ধূমোপহত ব্যক্তিকে ঘৃত ও ইক্ষুরস, অথবা কিসমিসের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। এইরূপ বমন দ্বারা আমাশয়াদি বিসৃজ্য হইলে ধূমগন্ধ নষ্ট হয় এবং শরীরের অবসন্নতা, হাঁচি অর, দাহ, মুচ্ছা, তৃষ্ণা, আশ্বান, শ্বাস, কাস প্রভৃতি প্রশমিত হয়। মধুর, অন্ন, কটু ও লবণ দ্রব্যের কবল ধারণ (কুল কুচা) করিলে ধূমোপহত ব্যক্তির মন প্রশম হয় এবং ইক্ষুর সকল সন্ধ্যা প্রকারে রসাদি গ্রহণ করিতে পারে। উপযুক্তরূপ শিরো-বিরেচন নস্ত্র প্রয়োগ করিলে ধূমোপহত ব্যক্তিকে অবিদাহী (বাহা থাইলে গলা বুক জ্বালা করে না), লঘু এবং স্নেহযুক্ত আহার প্রদান করিবে।

অতিতেজ অর্থাৎ বজ্রাগ্নি দ্বারা দধি হইলে প্রায়ই কোন ঔষধে প্রতিকারের আশা থাকে না, দধি ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ তাহার সর্বদা লেপন করিবে এবং স্নেহ দ্রব্য পরিষেক ও স্নেহযুক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

প্রসঙ্গ ক্রমে উষ্ণ বাতাদি দুধের চিকিৎসা

কথিত হইতেছে। উষ্ণ বায়ু বা রৌদ্র কর্তৃক দগ্ধ হইলে, শীতল দ্রব্য পরিষেক, শীতল প্রলেপ এবং শীতল অন্নপান প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। শীত (হিম তুষার) কর্তৃক দগ্ধ

হইলে (হিম দগ্ধে দাহ সাদৃশ্য থাকে বলিয়া লোকে তুষার দগ্ধ বলে) অথবা জল সংযুক্ত কর্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে।

বালক রক্ষা।

—:—

(প্রাণায়ামের আবশ্যকতা ও উপকারিতা)।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি-এল।

মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া জীবিত কালে ভুক্তি ও অস্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হইল। সর্বদ্রুত নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে সকলেই চায়। কিন্তু ইহার জন্ত শ্রেয়ের অহুসরণ না করিয়া, আপাতঃ বিবোধম পরিণামে অমৃতোপম সাত্ত্বিক স্নেহের চেষ্টা,—না করিয়া বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে স্নেহের চেষ্টা, রাজসিক স্নেহ—যাহা অগ্রে অমৃতোপম পরিণামে বিবোধম এবং তামসিক স্নেহ যাহা অগ্রে এবং পশ্চাতে উভয় অবস্থায় কষ্ট দায়ক তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা করে। জন্মিলে মরিতে হইবে এবং মরিলে জন্মিতে হইবে ইহা অবশ্যজ্ঞাবী এবং এই জন্মমৃত্যু প্রবাহ বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। এই কষ্ট ক্লিষ্ট ভয়ানক তাহা দেখাইবার জন্ত গত বর্ষের আয়ুর্কেদে আমরা ক্লিষ্টে সংসারে যাতায়াত করি—তাহাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত মনে করিয়া পাঠক মহোদয়গণ লেখকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু জানিয়া গুনিয়াই

লেখককে পাঠকের বিরক্তির কারণ হইতে হইয়াছে। যদি মৃত্যু ক্লিষ্ট যন্ত্রণাদায়ক, জন্ম ক্লিষ্ট যন্ত্রণাদায়ক এবং জন্ম মৃত্যুর অন্তরাল ক্লিষ্ট কষ্টকর দেখান না যায়, এবং বালককে তদ্বিষয়ে শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বালক ও বালকের অভিভাবকগণ শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় সাত্ত্বিক স্নেহ লাভের জন্ত তৎপর হইবেন না। কোন বিষয়ে সতর্ক করিতে হইলে তাহার বিচার করিয়া তাহার মন্দাংশ না দেখাইলে সে বিষয় হইতে কেহ বিরত হয় না। এই দেহ ও মন আমাদের সংসারের কারণ, আবার এই দেহ ও মন মুক্তির কারণ—

দেহ মূলো মনস্তাপো দেহ সংসার তারণম্।

দেহঃ কৰ্ম্ম সমুৎপন্নঃ কৰ্ম্ম চ দ্বিবিধং মতম্ ॥

দেহ হইতে মনস্তাপ জন্মে, দেহ জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সেই দেহ কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং কৰ্ম্ম পাপপুণ্যানুসারে দ্বিবিধ। দুঃখস্ত কারণং দেহঃ পঞ্চভূতায়ক শিবে। ততস্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখেঃ পরিত্যজ্যতে,

সোহাগ সজ্জায়তে মাতঃ কথং দেহো মহেশ্বরী।

হিমালয় কহিলেন হে শিবে! পঞ্চভূতায়ক দেহই হুঃখের হেতু। স্মৃতরাং দেহ অভাবে দেহীর কখনও হুঃখ বোধ সম্ভবনা, কিন্তু হে মহেশ্বরী! আমার প্রতি যদি অমুগ্রহ থাকে, তবে বিস্তারিতরূপে বলুন, সেই দেহ কিরূপে উৎপন্ন হয়?

(ভগবতী গীতা ।)

আবার চরক কি বলেন শুচুন।

জীবন্ হি পুরুষষষ্টিং কর্ণণঃ ফলমশ্নুতে (৭)

(ষষ্ঠ অধ্যায় নিদানস্থানম্)

কারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলেই কর্ণের ইষ্ট ফল ভোগ করিতে পারেন। পুনশ্চ—

সর্বমশ্নতং পরিত্যজ্য শরীরমছুপালয়েৎ

তদভাবে হি ভাবানাং সর্বভাবঃ শরীরগামিতি।

অন্য সমস্ত ফেলিয়া অগ্রে শরীর রক্ষা করিবে। কারণ তদভাবে শরীরাদিগের সর্বভাবেরই অভাব হয়। এই দুই ভাবে প্রথমতঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। মুক্তি শাস্ত্র ভগবতী গীতা কি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে লজ্বন করিতেছে? তাহা নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও মুক্তি শাস্ত্র। শরীর রাখিয়া, শরীর ও মন দ্বারা মুক্তি অর্জন করাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শরীর ও মন সর্ব সাধনের মূল! সেই জন্তই বলে “শরীরমাশ্রয়ং খলু ধর্ম সাধনম্।” শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে ও মন ভাল থাকিলে শরীর ভাল থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলেও যদি শোকাদি কোন কারণে মন খারাপ থাকে, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আনিয়া শরীরকে রুদ্ধ করে। আবার যদি মন বেশ ভাল থাকে, তখন যদি উৎকট শিরঃ পীড়াদি হয়, তখন মনও খারাপ হইয়া পড়ে, আমরা মাহাতে বেশ সুস্থ ও সবল

থাকিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারি, তাহাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। কারণ দীর্ঘকাল জীবিত না থাকিলে ভোগার্জন দ্বারা মুক্তি মার্গের অল্পসন্ধান করিয়া তাহার সাধন ও সিদ্ধি অসম্ভব। অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু ও জন্ম লইতে হইলে কেবল বাতায়তেই সময় কাটিয়া যায়, সংসারে থাকিয়া জ্ঞানার্জনের আর সময় পাওয়া যায় না। আমার একবার খুব কঠিন পীড়া হইয়াছিল। যখন প্রবল অর সেই সময় অল্প জ্ঞান আছে—এমন অবস্থায় মনে হইল, আমি পৃথিবীর একপার্শ্বে আসিয়া একটা জ্যোৎস্না আলোকিত স্থান দূর হইতে দেখিতেছি। সেই স্থানে যাইতে আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইতেছে ও মনে হইতেছে যে মরিয়া উচ্চ স্থানে যাইব। কিন্তু একটা বড় হুঃখ সেই সময় মনে উপস্থিত হইল যে, বাল্যকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আমি কে, কোথায় যাইব, কোথা হইতে আসিয়াছি ও সেই জীবনবানের পাদপদ্ম আশ্রয় লওয়া ভিন্ন সংসারে জন্মমরণ কষ্টের বিরাম নাই তাহা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রয় লইবার পূর্বেই চণ্ডিলাম; এই জ্ঞানটুকু লইয়া আবার যখন আসিয়া জন্মিব, তখন হারাইব। এই হুঃখে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। জগদীশ্বরের বড়ই কৃপা যে, তিনি আমার হুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রয় লইবার আর একটা সময় দিলেন, কিন্তু কই সে বিষয় তো কিছুই করিতে পারিতেছি না। বাল্যকাল হইতে বালককে জানাইয়া দিতে হইবে যে, সংসারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এটা একটা খেলার যায়গা। দিন কয়েকের জন্ত এই সংসার বিদেশে আসিয়াছি, আবার নিজ

দেশে চলিয়া যাইব। কিন্তু এই শরীর ও মন—যাহা আমার কষ্টের হেতু, তাহা যাহাতে আর গ্রহণ করিতে না হয়—তাহার জন্ত সেই ত্রীভগবানের ত্রীপাদপদ্ম লাভ করিবার উপায় করিয়া যাই—যাহাতে সেই স্বদেশে গেলে যেন তাঁহার ত্রীচরণে স্থান পাইয়া—আর এই সংসার বিদেশে আসিতে হয় না। আমরা যে এই জ্ঞানটুকু মৃত্যু ও জন্মদ্বার দিয়া আসিতে আসিতে ভুলিয়া যাই—তাহা আমাদের সাধনার অভাবে। আমাদের স্মৃতি আমরা অনেক প্রকারে হারাই। প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি। “আহার শুদ্ধৌতু” সর্বশুদ্ধি—“সর্বশুদ্ধৌ জ্বা স্মৃতিঃ স্মৃতির্ভ্যে সর্ব-গ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ” এই স্মৃতির প্রধান সহায় শুদ্ধ আহার। আহার মানে যে খাওয়া—জ্বা তাহা নয়। আমরা বাহিরের যে কোন জিনিস ভিতরে লইয়া যাই তাহাই আহার। কতক শরীরের আহার,—যেমন অন্নাদি ভোজন, ছন্দাদি পান। আবার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্, এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিতরের বিষয় গ্রহণ,—ইহা মনের আহার। যাহাতে এই উভয় বিধ শরীরের ও মনের আহার শুদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বালকদের বাল্যকাল হইতে শুদ্ধতা ও শৌচ রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নপর হইতে হইবে। আমাদের শরীর রক্ষার জন্ত যাহা বাহির হইতে শরীরের মধ্যে গ্রহণ করা যায়—তাহাই আহার। বায়ুভুক্ত বলিয়া একটা কথা আছে। বায়ুই আমাদের সর্ব প্রধান জীবন রক্ষার হেতু। বায়ু ব্যতীত আমরা বেশী ক্ষণ বাঁচিতে পারি না। আবার শুদ্ধ বায়ু না হইলে বাঁচিবার উপায় নাই। এই বায়ুই আমাদের প্রাণ। পঞ্চবায়ুই আমাদের প্রাণ। এই পঞ্চ বায়ু আবার উপপঞ্চাশ প্রকার

বলিয়া কথিত আছে। বায়ু একই,—কেবল ক্রিয়ার ভেদে নানা নাম যুক্ত। পঞ্চ অন্তর্বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। আমরা যাহাকে প্রাণময় কোষ বলিয়া থাকি—তাহা এই এই পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু ও পঞ্চ কশ্মল্লিয়। বাক্য, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। প্রাণ বায়ুর স্থান হৃদয়। ইহা প্রতি দিব্যরাত্রিতে ২১৬০০ বার খাস প্রস্থান রূপ কার্য্য করিতেছে ইহাকে অজপ্যা জপ করা বলে। ইহারই উপর আমাদের জীবন বা আয়ু। ইহারই গতি ইত্যাদি স্থির করিতে পারিলেই আমরা দীর্ঘায়ু হইতে পারি। অবশ্য অত্যন্ত বায়ু ও এ বিষয়ে সহায়ক, কিন্তু এই প্রাণ বায়ুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে উহা অত্যন্ত বায়ুকে নিজ স্থানে রাখিয়া কার্য্য করায় ও আমাদের দীর্ঘায়ু করায়। প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিয়মিত করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণ বায়ু উর্দ্ধ গমনশীল। অপান বায়ুর স্থান নাভির নিম্নে—শুষ্ক দেশ পর্য্যন্ত। ইহা অধোগমনশীল ও ইহার দ্বারা মল মূত্র ত্যাগ হয়। সমান বায়ুর স্থান নাভিদেশ। আমরা যাহা কিছু আহার করি—সেই আহারের পরিপক্ব রস নির্গত করিয়া নানা প্রকার নাড়ী দ্বারা সর্ব শরীরে লইয়া যাওয়া ইহার কার্য্য। আহাৰ্য্য রস পরিপাক করিয়া তাহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস মজ্জা শুক্র প্রভৃতি প্রস্তুত করায়, ইহাই বায়ুর কার্য্য। সকলকে সমান ভাবে রাখিয়া শরীরের কার্য্য সম্পন্ন করে ও প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া নিজে মধ্যে থাকিয়া মৃত্যুর সময় যখন প্রাণ ও অপান পরস্পর মিলিত হইতে চেষ্টা করে, সেই সময় সরিয়া যায়, প্রক্রিয়াহীন হয়, কিন্তু অন্যান্য

সময় প্রাণ ও অপানকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া নিজে মধ্যে থাকে এই জন্য ইহার নাম সমান। উদান বায়ুর স্থান কর্ণ। আমরা যাহা কিছু পান করি বা ভক্ষণ করি—তাহাকে বিভগ্ন করিয়া দেওয়াই ইহার কার্য। বান বায়ুর স্থান সর্বাঙ্গ। সর্বাঙ্গের সন্ধিস্থানের কার্য সর্বনাড়ী—গমনশীল—সর্ব শরীর স্থায়ী—এই বায়ুর কার্য। ক্ষয় ও পূরণ এই বায়ুর ক্রিয়া। এই পঞ্চ অস্ত বায়ু ও পঞ্চবহি বায়ু দ্বারা আমাদের শরীরের যতকিছু কার্য হইতেছে। ইহার নাগ, কুর্শ, ক্কর, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয়। এই বায়ুর ক্রিয়া শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—যথা,—প্রাণাস্ত বহির্গমনম্ অপানস্তাধোগমনং ব্যায়স্ত ব্যবসমাকুল্লর প্রসারণাদীনি সমাস্তাশিত পীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ উদানন্যোর্দ্ধ নয়নম্।

উল্লারে নাগ আখ্যাতঃ কুর্শ উন্মীলনে স্মৃতঃ।
ক্করাস্তুংকারো জ্ঞেয় দেবদন্তো বিজন্তনে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥

শ্রীধর গীতা।
বায়ুপঞ্চভূতের এক ভূত। কিন্তু ইহার সহিত অত্র চারি ভূত মিলিত আছে, তাহাদের গুণ এই প্রকার। যথা—বায়ুর মধ্যে যে আকাশ আছে তাহার গুণ প্রসারণ,—বায়ুর নিজগুণ ধারণ, তেজের গুণ বমন, জলের গুণ চারণ, পৃথিবীর গুণ আকৃষ্টন।

এই পঞ্চ বায়ুকেই প্রাণ বলা যায়।
এখন দেখা যাইতেছে যে বায়ুকে স্থির ও নিয়মিত করিতে পারিলেই আমরা সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী হইতে পারি। মন আমাদের বড়ই চঞ্চল। বিশেষ বালকদের মন বড়ই চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে যতই স্থির করিতে পারা যায়, ততই শান্তি আসে ও হৃৎপের লাভ

হইয়া স্থখ আসে। চঞ্চল মন যখন স্থির হয়, তখন তাহা বুদ্ধিবৃত্তি রূপে পরিণমিত হয়। যেমন তরঙ্গায়িত জলে চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব ঠিক দেখা যায় না, বহু খণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ আমরা এই চঞ্চল মনে সকল আনন্দের আধার জ্ঞান স্বরূপ সেই ভগবানকে তাহার ছায়ারূপে দেখিতে পাইয়া চঞ্চল মনে কোন কাজ হয় না। মনকে স্থির করিয়া একাগ্র করিতে পারিলেই ইহা দ্বারা কার্য এমন কি অসাধ্য সাধনও হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যের কিরণ যখন সাধারণ ভাবে থাকে, তখন তাহার উত্তাপ কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারে না। এমন কি সেই বিচ্ছিন্ন সূর্য্য কিরণ সমূহে উত্তাপ আছে বলিয়া বিশেষ বোধ হয় না। কিন্তু যদি কৌশল ক্রমে সেই বিচ্ছিন্ন কিরণ সমূহকে একমুখী করিতে পারা যায়, তবে তাহার কি প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি উপস্থিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। একখণ্ড কাচ যাহার উভয় পৃষ্ঠই মধ্যস্থল ক্রমে উচ্চ, তাহার যদি সূর্য্যের দিকে একখণ্ড কাগজ বা অত্র পদার্থ আনা যায়, তবে উহা উপরে ও নীচে লইয়া যাইতে যাইতে একটা এমন স্থানে আসিবে—যাহা ঐ কাচখণ্ডে পতিত কতকগুলি কিরণ এক পুঞ্জীকৃত করিয়াছে, সেইখানেই আসিবামাত্রই ঐ কাগজ খণ্ডটি পুড়িয়া যাইবে। যদি কতকগুলি কিরণ সমষ্টির এই শক্তি হয়, তবে আরও বেশী কিরণ সমষ্টির যে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি—তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সেইরূপ আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে যতই পুঞ্জীকৃত করিতে পারিব, ততই তাহার শক্তি বদ্ধিত হইবে। অন্যান্য মনোবৃত্তি বদ্ধ হইয়া বুদ্ধি বৃত্তিটি পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহার অন্যান্য মুখ বদ্ধ হইয়া গিয়া একটা মাত্র মুখ

প্রবল হয় তখন তাহার কোন বস্তুই অগোচর থাকে না। তখন দেখা যায় যে, বজ্র মনস্তত্ত্ব পদ্ম, যেমন পুষ্পরিণী জলে পদ্মপুষ্প ভাসমান দেখায়, কিন্তু যেমন বায়ু দ্বারা জল তরঙ্গায়িত হইলে সেই পুষ্পটিও চঞ্চল হয়—সেইরূপ মনও বায়ুর উপর অবস্থিত মনকে স্থির করিতে হইলে, ভিতরের বায়ুকে স্থির করিতে হইবে। এই বায়ু স্থির করিতে হইলে আমাদের প্রধানতঃ প্রাণ ও অপান বায়ু লইয়াই কাজ, কিন্তু বিশেষভাবে প্রাণ বায়ু লইয়াই কাজ।

আপানে জুহুতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে।

প্রাণাপান গতি রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ॥

গীতা—

এই শ্লোকে ভগবান দেখাইতেছেন যে, বাঁহারা প্রাণায়াম পরায়ণ হন, তাঁহারা কেহ আপানে প্রাণকে বলপূর্বক মিশাইয়া দেন, কেহ প্রাণে অপনকে বলপূর্বক মিশাইয়া দেন এই প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হন। এই প্রাণায়াম ক্রিয়াই শরীরের ও মনের অশেষ শক্তি আনিয়া দেয় ও আমাদের অস্থ ও দীর্ঘজীবী কি প্রকারে করে— তাহাই দেখান যাউক। আমরা দেখিতে পাই যে, এই জগতে কেহ মরিতে চায় না। সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা পর্যন্ত সকলেরই এই বাসনা। সকলেই যেন অমর হইতে চায়। যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত— অসহ যাতনায় কাতর, দারিদ্র্যের তাড়নায় মুহমান, আহাৰ্য্যভাবে অস্থি কঙ্কালসার, এক কথায় এ জীবনে যত কষ্টের অবস্থা হইতে পারে—তাহাও যদি একাধারে কাহারও হয়, তবুও সে মরিতে চায় না। কারণ পূর্ব সংস্কার তাহার হৃদয়ে অলঙ্কিত ভাবে জানাইয়া

দিতেছে যে, মরিলে কতই অসহ ও অনিবার্য যাতনা ভোগ করিতে হইবে, যে যাতনা পূর্ব পূর্ব ঋতুর মৃত্যুর পর ভোগ করিয়া জীব গর্ভাবাস কালে তাহা স্মরণ করিয়া অসহ যাতনা ভোগ পূর্বক এই তীব্র বাসনা করিয়াছে যে, এবার জন্ম হইলে আর বিষয় সেবা করিব না, সেই পরম দয়াময় শ্রীভগবান পাদপদ্মে মন অর্পণ করিব, কিন্তু জন্ম হইবামাত্র বৈষ্ণব্য বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া মহামায়ার নায়ার সবই ভুলিয়া যাব। কিন্তু সংস্কার থাকে বলিয়া মৃত্যুকে এবং সেই মৃত্যুর দূত ব্যাধিকে এত ভয় আসে। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে, কিন্তু কিসে দীর্ঘজীবী হইয়া মৃত্যুতত্ত্ব প্রেততত্ত্ব ও আত্মাকে জানিয়া অমর হইতে পারে—তাহার চেষ্টা করে না। অমর হওয়া অসম্ভব, কিন্তু আত্মতত্ত্ব ব্যক্তিই অমর। দীর্ঘকাল নীরোগ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতেও চেষ্টা করিলে মানুষ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। এই তত্ত্ব জানাই পরম হৃদভ, মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই বিদ্যাই বিদ্যা, আর অত বিদ্যা শিল্পনিপুণতা। এই দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য পূর্বে বহু চেষ্টা হইত, এখন হয় না। আমাদের নিজের যখন সে চেষ্টা নাই, তখন বালকদের কি প্রকারে থাকিবে? এই বিষয়ে বালকদের ইচ্ছা জাগাইতে হইবে, যদি বালককে প্রথম হইতে এই শিক্ষা দেওয়া যায় যে, তাহার দীর্ঘকাল নীরোগ ভাবে জীবিত থাকিয়া সর্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ ও ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে, তবেই তাহারা সে বিষয়ে চেষ্টা করিবে। এখনকার কালে বালককে সামান্য বিদ্যা শিক্ষা—বাহাকে শিল্প নিপুণতা বা উদ-

রোগের ব্যবস্থার বিদ্যা বলা যায়—তাহাই উপা-
র্জনের জন্য—সংসারে ভীষণভাবে বদ্ধ হইবার
জন্ম তাহাদের স্বাস্থ্যহানি করিতে প্ররম্ব দেওয়া
হয়। সেই জন্ম আমাদের বালকেরা যখন বিশ্ব
বিদ্যালয় হইতে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
যৌবনের উল্লাসে সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়,
যখন গৃহস্থ হয়, তখন সে মৃত কি জীবিত,
তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। তাহাদের
অস্থিচর্ম্ময় দেহ দর্শন—প্রভৃতি করিয়া
কি মনে হয়? তাহাদের বংশধরগণ যে
কি হইবে—তাহাদের দেহ খানি দেখিলেই
বোধ হয়। যদি বালকের মনে স্বাস্থ্যের ভাব
জাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেও শরীর
অথবা নষ্ট করে না, অভিভাবকেরা তাহার
পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও
তাহাকে অকালে কাল গ্রাসে পতিত করিতে
পারেন না। এই দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্ম
মহাতপা ভরদ্বাজ যুনি ইন্দের নিকট আয়ুর্বেদ
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই অমূল্য
চরক সংহিতার উৎপত্তি।

দীর্ঘজীবিত মন্নিচ্ছন ভরদ্বাজ উপাগমঃ ।

ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যামরেশ্বরম্ ॥

দীর্ঘজীবিত হইতে হইলে যিনি নিজে দীর্ঘজীবী,
তাহার নিকট না গেলে কোথায় সেই উপায়
জানিতে পারা যাইবে? তাহার পর যিনি
স্বয়ং অমর ও অমরেশ্বর তিনিই ত ইহা বলিয়া
দিবার সর্বোৎকৃষ্ট পাত্র। যদি এই চরকোক্ত
বিষয় সরল ভাষায় কিছু কিছু সংক্ষেপ করিয়া
প্রত্যেক বালককে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং
অভিভাবকেরাও উহা শিক্ষা করিয়া চরকোক্ত
মতে চলেন ও বালকদের যথাসম্ভব চালান,
তাহা হইলে আমাদের দেশে এত রোগ ও
অকাল মৃত্যু ও বংশলোপের আশঙ্কা থাকে

না। রোগ হইতে না দেওয়াই ভাল, রোগ
হইলে চিকিৎসা দ্বারা আরাম করা ভাল নয়।
বাহাতে রোগ মোটেই না হইতে পার, সেইটা
কি ভাল নয়? রোগই আমাদের উন্নতির
অস্তরায়। চরক সংহিতায় আছে

বিষভূতা যদা রোগাঃ প্রাহুর্ভূতা শরীরিণাম্ ।

তপোপবাসাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতায়ুৰ্বাম্ ॥

রোগ সকল প্রাহুর্ভূত হওয়াতে মানব-
দিগের তপস্তা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও
আয়ুৰ বিয় উপস্থিত হইল। এইগুলিই যুক্তির
সোপান, আর যদি এইগুলিতেই বিয় হয়, তবে
মানুষ কি প্রকারে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করিয়া
পরমব্রহ্মে লীন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে
পারিবে? আয়ুই হিত এবং আয়ুই অহিত ;
অর্থাৎ অন্নায় বা রোগঘুক্ত আয়ু অহিত এই
প্রকার আয়ুই সুখ,—আয়ুই দুঃখ।

হিতাহিতং সুখং দুঃখং মায়ুস্তস্মৈ হিতাহিতম্ ।
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু
বলে।

শরীরেন্দ্রিয় সন্ধ্যাত্ম সংযোগোধারি জীবিতম্ ।

তন্মাধ্যো আত্মা অনহ, অমর, নীরোগ,
বিকারহীন এবং অব্যয়। বাকী শরীর, ইন্দ্রিয়
ও মন ঘটবিকার যুক্ত উৎপত্তি ও নাস্তশীল
হইলেও স্বল্পদেহে ভোগের জন্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব
কামনাবশতঃ তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সুখ
দুঃখ ভোগ করার তাহার লয় না করাইতে
পারিলে সাধারণ সুখ বা দুঃখের হাত হইতে
অব্যাহতি নাই! ত্রীভগবানের ত্রীপাদপদ্মে
ভক্তি দ্বারা যোগবলে মনকে লয় করাইতে
পারিলেই ব্রহ্ম সাংসারিক বা ব্রহ্মস্বরূপ বা
মুক্তিলাভ করা যায়।

শরীরং সর্ব্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়োমতঃ ।

তথা সুখানাং যোগস্ত সুখানাং কারণং সমঃ ॥

নির্দীকার পরমাত্মা সত্ত্বভূত গুণেন্দ্রিয়ৈঃ ।
চৈতন্ত্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্চতি হি ক্রিয়াঃ ॥
বায়ুঃ পিত্তং কফশোভঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ ।
মানসঃ পুনরুদ্বিষ্টো রজশ্চ তম এব চ ॥
প্রশাম্যাতোষধৈঃ পূর্বো দৈবযুক্তি ব্যাপাশ্রয়ৈঃ ।
মানসো জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্য শ্রুতি সমাধিভিঃ ॥

চরক সংহিতা ।

শরীর ও মন ব্যাধিগণের আধার, আর কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্ণবের যথাযোগ্য আরোগ্যের কারণ । পরমাত্মা নির্দীকার এবং ইহার চৈতন্ত্য সম্বন্ধে মন, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয় সকল কারণ স্বরূপ । পরমাত্মা নিত্য, দ্রষ্টা এবং সাক্ষীস্বরূপ । বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরের দোষ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মনের দোষ । যাহা বিকারপ্রাপ্ত হইলে রোগ হয়, তাহাকে দোষ বলে । শারীরিক দোষ—দৈব যুক্তির দ্বারা শাস্ত হয়, আর মনের দোষ—জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, শ্রুতি ও সমাধি দ্বারা শাস্ত হয় ।

বায়ু পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থায় শরীর নীরোগ থাকে ও এক ছই বা তিনের বুদ্ধিতে ব্যাধি উৎপন্ন হয় । মনের মধ্যেও তিনগুণ খেলা করিতেছে, যখন ত্রিগুণের বাহিরে আসা যায়, তখনই পরমানন্দ লাভ হয়, আর যখন তমঃ গুণের মধ্যে থাকা যায়—তখন মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা, প্রমাদ, আগন্তুর অন্ধকার দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত রাখা হয়, আর তমকে দমন করিয়া—রজঃকে আশ্রয় করিলে, সর্বদা উৎসাহ লাভ—এ কার্য্য হইতে অল্প কার্য্য করে, আমরা সংসারে খুব বাহ্যছরি করি—ইত্যাদি চেষ্টা হয়, ইহারও জ্ঞান আবৃত থাকে, কিন্তু সত্ত্ব নির্মল ও প্রকাশক বলিয়া জ্ঞানকে প্রকাশ করেনা এবং যখন জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকার হয়—তখন সত্ত্ব সরিয়া যান এবং তখন মনে লয় হইয়া

গুণাতীত বা মুক্ত অবস্থা আইসে । শরীরের সহিত মনের খুব সম্বন্ধ । ইন্দ্রিয়গণ উভয়কে সাহায্য করে । শরীরকে ও মনকে ভাল দেখিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গণকে বিপথে যাইতে না দিয়া সুপথে সৰল রাখিতে পারিলেই উন্নতির পথে অগ্রগামী হওয়া যায় । কফ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, পিত্তের ও বায়ুর ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া জীবন নাশ করে । মৃত্যুকালে কফেরই এই কার্য্য । তমঃগুণ সেইরূপ মনকে প্রেবিত্ত অর্থাৎ সংসারে স্থখী করাইয়া, পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের কষ্টের কারণ হয়, এমন কি, মৃত্যুকালে তমঃ গুণকে মন অবলম্বন করিলে, পঞ্চাদি—বৃক্ষাদিনীচ ঘোনীও প্রাপ্ত হয় । রজঃ গুণকে অবলম্বন করিয়া মরিলে এই সংসারেই থাকিতে হয়, আর সত্ত্ব গুণকে অবলম্বন করিয়া মরিলে স্বর্গাদি সুখের লোক ভোগ হয় । মনের সত্ত্বগুণে স্থিতি কালই স্নেহের কাল । পিত্ত দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য হয়; ইহা রজোগুণের তায় । আর বায়ু শরীরে সাম্যাবস্থায় থাকিলেই সুখ, এবং বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোগ হয় বটে—কিন্তু বায়ু সুপথে চালিত হইলে শরীরকে ও মনকে সুস্থ রাখে ও দীর্ঘজীবনের সহায়তা করে । প্রথমে কফকে, পরে পিত্তকে শাস্ত করিয়া আমাদের বায়ু লইয়া ক্রিয়াদি করিলেই সর্ব রোগ নষ্ট ও দীর্ঘজীবন লাভ ও মৃত্যুকালে এই বায়ুকেই সুষুমা মার্গ দিয়া লইয়া গিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র প্রাণব্যাপী এই বায়ুকে বহির্গত করিতে পারিলেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । এই বায়ুই আমাদের প্রাণ বা পঞ্চপ্রাণরূপে শরীরে নানা কার্য্য করিতেছে । এই বায়ু আমাদের নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাস রূপে জীবনকে রক্ষা করিতেছে, এই বায়ু যাহাতে নির্মল ও পবিত্র হয় এবং আমরা

সর্বদা দুর্গন্ধ বিহীন নির্মল ও পবিত্র বায়ু শ্বাস প্রাশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি—তাহার চেষ্টা করি ও বালকগণকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দিয়া তত্ত্বাবে রাখি। পূর্বে লেখা হইয়াছে যে, আমরা দিবসে ২১৬০০ বায়ু শ্বাস প্রাশ্বাস গ্রহণ করি। ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন, ৬০ মিনিটে

$$\frac{21600}{24 \times 60} = 15$$

একঘণ্টা—অর্থাৎ প্রতি মিনিটে আমরা ১৫ বার শ্বাস প্রাশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। প্রকৃতির আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জীব একই সময়ে যত কম শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে সে—তত দীর্ঘজীবী হয়, আর যাহারা বেশী ত্যাগ ও গ্রহণ করে—তাহারা অল্পায়ু হয়। কেবল যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে শ্বাস সংখ্যা কম হইলে প্রাণী দীর্ঘজীবী হয় তাহা নয়, উহা আবার অল্পায়ু অর্থাৎ হ্রাস হওয়া আবশ্যিক। শ্বাস দীর্ঘ হইলে আয়ু কম হয়। পূর্বে যে ২১৬০০ শ্বাসের কথা বলা হইয়াছে, ইহা অল্পায়ু কলির জীবের। পূর্বে লোক দীর্ঘজীবী ছিল, সেই জন্ত তাঁহাদের শ্বাস সংখ্যা প্রতি মিনিটে—১১১২ ছিল, এখন আয়ু অল্প হইয়া পড়ায় উহা ১৫১৬ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতে পাই—কুকুর, ছাগল প্রভৃতি প্রাণী খুব ঘন ঘন ও দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে ও খুব অল্পায়ু হয়। সর্প, ব্যাং, কচ্ছপ খুব কম ও অল্পায়ু শ্বাস প্রাশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে, সেই জন্ত তাহারা সব জীব অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়। পণ্ডিত প্রবর জীবন্ত কালীর বেদান্ত বাণীশ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি ও তাঁহার লিখিত তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, কোন জীব শ্বাস

সংখ্যায় ও শ্বাস-আয়তনের অল্পতা হেতু কি প্রকার দীর্ঘজীবী হয়।

প্রাণী প্রতি মিনিটের প্রায়িক প্রায়িক পরমাণু

	শ্বাস সংখ্যা	বয়স
শূশ	৩৮৩৯	৮
কপোত	৩৬৩৭	৮৯
বানর	৩১৩২	২০.২১
কুকুর	২৮১২	১৩.১৪
ছাগল	২৩২৪	১২.১৩
বিড়াল	২৪১২	১২.১৩
ঘোড়া	১৮১৯	৪৮.৫০
মহুয়া	১২১৩	১০০
হস্তী	১১১২	১০০
সর্প	৭৮	১২০.১২২
কচ্ছপ	৪৫	১৫০.৫৫

যাহাদের প্রতি মিনিটে শ্বাস সংখ্যা যত বেশী হয়, তাহাদের রক্ত সঞ্চালন ও কৃস্কৃসের ক্রিয়া তত বেশী হয় এবং শরীর বলবান, সুদৃঢ় ও বৃহৎ হইলেও আয়ু কম হইয়া পড়ে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, আমরা যতই শ্বাস সংখ্যা প্রতি মিনিটে কম ও অল্পায়ু করিতে পারিব—ততই দীর্ঘজীবী হইব ও তদ্বিপরীতে অল্পায়ু হইব। আমাদের শ্বাস সংখ্যা যে প্রতি মিনিটে বেশী হয়—কেবল—বেশী হয় তাহা নয়—উহা আরও দীর্ঘ হইয়া আমাদের আয়ু হ্রাস করে। সেই জন্ত বালকদের বেশী দৌড়াদৌড়ি খেলা করিতে দেওয়া উচিত নয়। ফুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের দেশে আমাদের বালকের সর্বনাশ করিতেছে—তাহা এই বায়ু তত্ত্বেই পর্যালোচনার জানা যাইতেছে। ইংলণ্ডের লায় শীত প্রধান দেশের উহা উপযোগী ও উহা সেখানকার মত্ত মাংস খাদক সাহেবদের উপকারী বলিয়া উহা আমাদের দেশের

শাক-চচ্চড়ি-ভাত খাওয়া ও গ্রীষ্ম প্রধানদেশে বাস করা ও ক্রমশঃ হীনবীৰ্য্য বালকের পক্ষে কি উপযুক্ত হইবে? কলির ভীম ত্রিযুক্ত রামমুন্ডি বলেন যে, যে ব্যায়াম দ্বারা বেশী খাঁস ক্ষয় হয়—তাহা শরীরকে বলবান করিলেও তাহা আয়ুকে হ্রাস করে। আমাদের দেশে যে ভাবে বালকেরা ফুটবল-ক্রিকেট প্রভৃতি দৌড়াদৌড়ি খেলা করে—তিনি তাহা আমাদের সম্পূর্ণ হানিকর বলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের দেশের পালোয়ানেরা যাহারা কেবল ব্যায়াম দ্বারা ও আহাৰ দ্বারা শরীরকে বলবান করিয়াছে—খাঁস রক্ষা বিষয় কিছুই চেষ্টা করা নাই—তাহারা ৩০।৩২ বৎসরের বেশী জীবিত থাকে নাই। ফুটবল অপেক্ষা ডন্ বৈঠক, বার-একসারসাইজ, মুগুরভাঁজা, ডবল ভাঁজা, সেগোর মতে ব্যায়াম করা—অনেক ভাল, কিন্তু বাহাতে খাঁস রোধ করিয়া ব্যায়াম করিতে হয় ও খাঁস দীর্ঘ ও ঘন না হয়—তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রফেসার রাম-মুন্ডি বক্ষের উপর হস্তী দণ্ডায়মান করাইবার পূর্বে একটা বর্জতা করেন, তাহাতে বলেন যে, উহা পশু বলের দ্বারা সাধিত হয়। উহাতে পবনের বলের আবশ্যক। আমাদের দেশে বলবানের আদর্শ ভীম ও হুমান। উভয়েই পবন পুত্র বলা হয়। তাহারা পবনকে আশ্রয় করিয়া তাহার দ্বারা সংসারে বহু হস্তীর বল ধারণ করিতেন। তিনি আরও বলিলেন যে, উহা বায়ু ধারণ ও চিত্ত বৃত্তি নিরোধ দ্বারা সমাহিত হয়। হস্তী বক্ষে চড়াইবার পূর্বে আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি যখন সমভাবে একটা অপ্রশস্ত গদীর উপর শুইলেন, তখন স্থিরভাবে সর্ব শরীর রাখিলেন, কেবল হুই পা নাড়িতে লাগিলেন।

তখন তাঁহার বক্ষ ক্রমশঃ স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। তাহার পর যখন পায়ে নড়া স্থির হইল, অমনি তাঁহার লোক তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তক্তাটা একটা গোড়ি দিয়া বৃকের উপর দিল এবং সমতল ভাবে হস্তীকে বৃকের উপর তক্তার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দিল। হস্তী যাইবার সময় যখন তক্তার চারি পা দিল, তখন উহা বৃকের উপর সমতল হইল, তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল। হস্তী নামিয়া যাইবামাত্রই তাঁহার অস্থচরণ তাঁহাকে ঘেন জোর করিয়া হাত বাহা বৃকের উপর স্থাপিত ছিল খুলিয়া সরাইয়া দিল এবং উহাকে ঘেন ক্ষণিক অজ্ঞান অবস্থা হইতে উঠাইল। যেন তিনি ক্ষণিক সংজ্ঞাহীন ছিলেন এইরূপ বোধ হইল আমাদের বলের স্থান বক্ষ ও বায়ুই বল। বায়ুই আয়ু, বায়ুই জীবন বায়ুই সব। বায়ু স্থির হইলে মন স্থির হয়। চঞ্চল মন স্থির হইলে একাগ্র হইতে পারা যায় এবং একাগ্র মনের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া সংসারে সকল বস্তুই লাভ করিতে পারা যায়। সকলেরই মূলে বায়ু। এই বায়ুকে সংযত করাই ভক্তি ও মুক্তির প্রধান উপায় ও উহা কেবল প্রাণায়াম দ্বারা হইতে পারে। প্রাণায়াম দ্বারা দীর্ঘ খাঁস ত্যাগ কম হয় উহা ক্রমশঃ অদ্বারত হয় এবং চিত্তকে স্থির করে। এই বায়ুই হুই নামে ইড়া-পিঙ্গলায় চলিতেছে। কখনকোন নাড়ীতে চলিতেছে—ইহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক কারণ কোন সময় কোন কার্য করিলে উপকার হইবে, কোন সময় অনিষ্ট হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যখন ইড়াতে বায়ু বহে তখন ভোজন করিলে উহা জীর্ণ হয় না কিন্তু পিঙ্গলা বহন কালে ভোজন করিলে জীর্ণ হয়। প্রাণায়ামে বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসে

তাহা জানা আবশ্যক। উহার যত বেশী পরিমাণ বাহিরে আইসে—ততই আমাদের শরীরের ক্ষয় সম্পাদন করে। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে কেবল যে যাহাতে শরীরের উৎকর্ষতা লাভ হয়—এমন খাদ্যাদি ভোজন করিলে চলিবে না। উহার সর্বপ্রকার ক্ষয় যথাসম্ভব নিবারণ করিতে হইবে। শুক্রক্ষয়ে শরীর যে শীঘ্রই পতনোন্মুখ হয়—তাহা কে না জানে? কিন্তু কই তাহা হইতে কে নিবারণ করিবে? লোকে জানে যে, শুক্র ক্ষয়ে দেহ নাশ হয়, কিন্তু তাহা হইতে বিরত হয় না। এই জন্যই অর্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

“অথ কেন প্রযুক্তেহয়ং পাপং রচিতং পুরুষ।
অনিচ্ছন্নাপি বাঞ্ছয়ং বলাদিব নিয়োজিতং॥”

হে-রুক্ষিণ! পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও লোকে কাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপ আচরণ করে?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপমা বিঘ্নেন মিহ জৈরিণন্ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন, ইহা রজোগুণ জাত হুৎসরগীর্ণ ও অত্যুগ্র কাম। সত্ত্বগুণের বুদ্ধি দ্বারা রজোগুণের ক্ষয় হইলে কাম জন্মে না এবং কোন কারণে বাধা পাইলে ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। কাম মুক্তি মার্গের প্রধান শত্রু জানিও। তাহার পরে শ্রীভগবানু কিরূপে কামকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই উপদেশ মত চলিতে পারিলে কাম দমিত হয় ও পাপাচরণ নিবৃত্ত হয়। প্রাণায়াম কামদনের প্রধান মন্ত্রণ।

শুক্র সর্ব্বধাতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার ক্ষয়ে যে শরীরে ভীষণ ক্ষয় হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা সকল সময়ে ক্ষয় করিবার সুযোগ ও সময় হয় না, যখন হয় তখন ভীষণ ভাবে হয়। কিন্তু বায়ু অসংযমতায় যে ক্ষয় হইতেছে—তাহা অহরহঃ হইতেছে। আমরা কেহই ক্ষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখি না। কোন বিষয় বিচার করিয়া তাহার ভিতরে কি আছে না দেখিয়া সকলে যাহা ভাল বলে তাহাই বলি। আমি একদিন উকীল মহলে বলিলাম যে, আধুনিক হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের ছেলেদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। অমনি সকলেই আমাকে ঠাট্টা করিলেন ও বলিলেন “ছেলেদের স্বাস্থ্য না খেলিলে কিসে ভাল হইবে? আমি নিজ পক্ষ সমর্থন জন্য দুই একটা কথা বলিতে চাহিলাম, কিন্তু উপহাসের অউহাসে আমাকে মৌন থাকিতে হইল। একে ছেলেদের মন সর্ব্বদা চঞ্চল, তাহার উপর বালস্তাবৎ জীড়াশক্ত স্তব্ধতা বৎ তরুণীলগ্নঃ। বৃদ্ধ স্তাবচ্ছিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মপি কোহপিনলগ্নঃ সেইথেলায় বালকদিগকে উত্তেজিত করিলে তাহাদের মন সংযত করার ব্যবস্থায় একবারে জলাঞ্জলি দেয়। একদা একটা উকীলের দুইটি পুত্রের হৃদরোগ হইয়া পীড়া কঠিন হইয়া পড়িল। ডাক্তার দেখান হইল, কিছু ফল হইল বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ থাকিল। আজকাল ডাক্তারেরাও ভাল হার্টটনিক বলিয়া মকরধ্বজ ব্যবহার করেন, সেই মতে বহুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীশিবাবু অর্জুনছালের রস দিয়া মকরধ্বজ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তারি ঔষধ ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছুদিন পরে বেশ উপকার বোধ হইল। বালক দুইটি এখন

নিরাপদ, তবে বেশীদিন স্ফটিকিংসার স্থানিয়মে ও স্থপথ্যে না থাকিলে এ রোগ আরাম হইবে না। রোগের প্রবলাবস্থায় মানকের বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ গুপ্ত মহাশয়কে বালকদ্বয়কে দেখান হইলে তিনি বলিলেন যে, অতিরিক্ত দোড়াদোড়ি ও হকি খেলাই উহার কারণ। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বালকদ্বয় পিপাসায় থাকিতে না পারিয়া শীতল জল পান করিয়া এই কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়া উক্ত উকীল বাবু আমাকে তৎপর দিন বলিলেন যে, “আপনি ঠিক বলিয়াছিলেন, বালকদের ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলা বড়ই অনিষ্টকর। কবিরাজ মহাশয় আমার ছেলেদের দেখিতে আসিয়া প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন, ছেলেরা হকি কি ফুটবল খেলে কি না? বড়ই আশ্চর্যের বিষয় তিনি কি করিয়া জানিলেন যে, আমার ছেলেরা হকি-ফুটবল খেলে। অতঃপর আর ছেলেদের ওরূপ খেলিতে দিব না। আশা করি আমার উকীল ভ্রাতার স্থায় বালকদের অসহ্য অভিভাবকদের চৈতন্য হইবে। তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত শ্লোক কয়টি পড়িয়া ভাবিবেন।

দেহান্নির্গতোয়ানুঃ স্বভাষাদ্ভাদশাঙ্গুলিঃ।

গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতি স্তথা ॥

চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পাশ্বে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।

মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদ্রক্তং ব্যায়ামেচ ততোধিকম্ ॥

স্বভাবেন্দ্রিয়া গতোমূলে পরমায়ুঃ প্রবর্ততে চাস্ত-

রোদগতে।

আয়ুঃক্ষয়োহধিকে প্রোক্তো মারুতে চাস্ত-

রোদগতি ॥

পবন বিজয়স্বরোদয় ॥

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাশ্বাসে ১২ আঙ্গুলি বাহিরে বাওয়াই স্বাভাবিক। গান গাহিবার সময় ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ২০ অঙ্গুলি, দোড়াইয়া গেলে বা বেশী পথ চলিলে ২৪ অঙ্গুলি, নিদ্রাকালে ৩০ অঙ্গুলি মৈথুনে (ইহাতে অষ্ট প্রকার মৈথুন ধরা যাইতে পারে) ৩৬ অঙ্গুলি, এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। যে ব্যক্তি যত স্বাভাবিক অর্থাৎ ১২ অঙ্গুলি বহির্গতি ঠিক রাখিতে পারেন, তিনিই পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পারেন। আর যদি প্রাণ বায়ুর বহির্গতি অর্থাৎ প্রাশ্বাস দীর্ঘ হয়, তবে উহা যতই দীর্ঘ হইবে ততই আমাদের প্রাণ নাশ শীঘ্র হইবে। এই জন্য প্রাশ্বাসের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন কারণে উহা অস্বাভাবিক অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্গুলির বেশী হয়, তবে প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা ঐ দ্বাদশাঙ্গুলিকেও হ্রাস ও স্বাস প্রাশ্বাসের মাত্রা কমাইয়া দিয়া সেই ক্ষয় পূরণ করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডায়াণ হওয়ার আবশ্যক নাই যে, ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে ক্ষয় করিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে। প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা শরীর অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হইবে, শরীরের ক্ষয়কে নিবৃত্তি করিবে, মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া মনকে একাগ্র করিবে, বুদ্ধি বৃত্তিকে সতেজ তীক্ষ্ণ ও একাগ্র ও শুদ্ধ করিবে, শরীরকে নীরোগ রাখিবে, কামকে দমন করিবে, আশ্বাস দিগকে দীর্ঘজীবি করিবে, শরীরে শীঘ্র কোনো রোগ থাকিতে দিবে না,—যদি আসে শীঘ্র দূর করিয়া দিবে এবং ইহকালে আনন্দ দান করিয়া পরকালে সেই পরম রমণীয়কে দর্শন বা তাহার সহিত মিলিত করিবে। (ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

(কবিরাজ শ্রীস্বধাংশু ভূষণ সেনগুপ্ত।)

পুরাতনজর।—(১) নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কালতুলসীর পাতা ও গোল মরিচ—সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে বাটিয়া ছোলার মত বাটিকা করিবে। প্রাতঃকালে ইহার একটি করিয়া বাটিকা চোনার সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলে কয়েকদিন মধ্যে বিষম জ্বর প্রশমিত হয়। (২) গোলমরিচ, নাটার শাঁস ও গুলঞ্চ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা ও চিতামূল চূর্ণ ৩ তোলা, একত্র মিশাইয়া ছুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। (৩) চিরতা, গুলঞ্চ ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, সমান ভাগে মিশাইয়া লইবে। প্রাতঃকালে ইহা ছুই আনা হইতে চারি আনা পর্যন্ত মাত্রায় বিষম জ্বরে সেবন করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। (৪) ক্ষেপাঁপড়ার রস ১ তোলা ও শিউলির পাতার রস ১ তোলা—গরম করিয়া মধুর সহিত সেবনে বিষম জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। (৫) আদার রস, গুলঞ্চের রস, সিউলিপাতার রস, ক্ষেপাঁপড়ার রস—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় লইয়া গরম করিয়া, প্রাতে ও বৈকালে ১ বার করিয়া সেবন করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (৬) গুলঞ্চ, ক্ষেপাঁপড়া, বেলপাতা ও শিউলিপাতা—প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র কুটিয়া আগুনে গরম করিয়া যে রস বাহির হইবে, তাহা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবনে জীর্ণ জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। (৭) আপাংয়ের রস

আখিন—৬

অথবা অপরাজিতার রসের ন্যায় লইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (৮) কণ্টকারী তেউড়ী, কেওরিয়া, ক্ষেপাঁপড়া ও মুখা—প্রত্যেক দ্রব্য ১০/১০ আনা ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া কয়েকদিন পান করিলে, পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

রক্তাভীসারে। (১) আম, জাম ও আমলকীর পাতার রস প্রত্যেকটি ১০/১০ ওজনে লইয়া কিঞ্চিৎ মধু বা চিনির সহিত মিশাইয়া কয়েকদিন সেবনে রক্তাভীসার প্রশমিত হয়। (২) কুড়চির ছাল, দাড়িম ফলের খোসা, মুখা, বেলগুঠ ও ধাইফুল—প্রত্যেক দ্রব্য ১০/১০ ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথে সেবনে রক্তাভীসার প্রশমিত হয়। (৩) জায়ফলের গুড়া, লবঙ্গের গুড়া, জীরাভাজার গুড়া ও সোহাগার থই—ইহাদের চূর্ণ সমানভাগে মিশাইয়া, প্রাতঃকালে চারি আনা পরিমিত এই ঔষধে অন্ন মধু দিয়া সেবন করিলে প্রবল আমাভীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) কেবল মাত্র কুড়চির ছাল ২ তোলা, জল আধসের, শেষ ১/১০ পোয়া—এই কাথে একটু মধু মিশাইয়া কয়েকদিন পান করিলেও প্রবল আমাভীসার আরোগ্য হইয়া থাকে।

অভীসারে। (১) জায়ফল বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল অভীসারও আরোগ্য

হইয়া থাকে। (২) বেলগুঁঠা ও আমের আঁটির শাঁস—সমান ভাগে গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া অল্প চিনির সহিত সেবনে অতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে। (৩) বাবলা, গাছের কচি পাতার রস ১ তোলা করিয়া কয়েকদিন সেবনে অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) কর্পূর, সাজিমাটি ও গোলমরিচ—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ আনা, এই দ্রব্য কয়টি শীতল জল সহ বাটিয়া সেবন করিলে অতীসার রোগীর শূল বেদনা আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমাশয় রোগে। (১) পেয়ারার কচি পাতার রস চারি আনা পরিমাণে দিবসে ১ বার করিয়া সেবনে আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। (২) গন্ধ-ভাঙ্গুল্যার রস ২ তোলা অল্প মধুর সহিত পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) আমরুল পাতার রস অর্দ্ধছটাক প্রাতে এবং বৈকালে পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) কুঁকসিম পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক একটু চিনির সহিত সেবনে আমাশয় রোগ সত্তা আরোগ্য হইয়া থাকে। (৫) কচি বনমূলা পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক করিয়া কয়েক-দিন চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলেও আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়।

রক্তমাশয় রোগে। (১) বাবলা গাছের কচি কুঁড়ি ১০ আনা—চিনির সহিত বাটিয়া প্রাতে ও বৈকালে একবার করিয়া সেবন করিলে রক্ত-মাশয়রোগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে। (২) আমরুলের শিকড় চারি আনা—গোল মরিচ আড়াইটা, জীরা আড়াইটা—একত্র বাসি

জলের সহিত বাটিয়া ৩৪ দিন সেবন করিলে রক্তমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) দুর্ব্বার রস ১ তোলা করিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) কচি দাড়িমের পাতার রস ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তমাশয় রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণী রোগে। (১) পাকা কয়েদ বেলের পাতা-মিছুরির সহিত মিশাইয়া সমস্তদিনে ২১৩ বার সেবনে গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়। (২) শ্বেত চন্দন ও কর্পূর—একত্র পিষিয়া লইয়া নাভিমূলে প্রলেপ দিলে গ্রহণী রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে। (৩) মুখা ও লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য ১০ আনা লইয়া উত্তনরূপে পিষিয়া লইবে। তাহার পর উহা অগ্নি সন্তাপে গরম করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে গ্রহণী রোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

অর্শ রোগে। (১) হরীতকীর গুঁড়া ১০ তোলা ও চিনি ১০ তোলা জলের সহিত শয়নকালে সেবনে অর্শরোগ নিবারিত হয়। (২) মাখন ও মিছুরি প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ১০ তোলা একত্র মিশাইয়া কয়েকদিন সেবনে অর্শ উপশমিত হয়। (৩) উচ্ছে পাতার রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবনে অর্শ রোগের শাস্তি হইয়া থাকে। (৪) বনজাড়া ও আদ সমান ভাগে বাটিয়া সেবনে অর্শরোগের শাস্তি হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি)

বাসের কণ্ঠে।—খাসের কণ্ঠ নিবারণ করিবার জন্ত আমড়া পোড়াইয়া তাহার খোসার পরেই যে সার পদার্থ থাকে, তাহা ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশাইয়া বক্ষঃস্থলে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। শিশুদিগের বুকে সর্দি বসিলে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সমস্ত দিনে ৩ বার মালিশ করিতে হইবে। শুক শ্লেষ্মা সরল করিবার পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

ঘুঙ্কিতে।—শিশুদিগের বুকে সর্দি বসিয়া বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিলে, আদার রস ও মধু—সমান ভাগে লইয়া অগ্নি সত্তাপে আদার রস শুকাইয়া, শুধু মধু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। ইহা সমস্ত দিনে ২।৩ বার অল্প অল্প করিয়া সেবন করাইলে প্রবল ঘুঙ্কি রোগে মল্লশক্তির মত ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কো-কাইটিসে—যেখানে অনেক ঔষধ ব্যর্থ হইয়া থাকে, সেখানেও এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

সর্দিতে।—শিশুর সর্দিতে খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া ছই পায়ের তলায় রাত্রিতে উত্তম-রূপে মালিশ করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। পিপুলের গুঁড়া ও মধু, তুলসীর রস ও মধু, আদার রস ও মধু—এইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকারী।

ক্রিমিতে।—পালিখামাদারের পাতার রসে অল্প মধু বা চিনি মিশাইয়া প্রাতঃকালে একবার

করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রসের পরিমাণ ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে ১ ঝিহুকের এক অষ্টমাংশ;—ঐ হিসাবে মাত্রা বাড়াইয়া ১০।১২ বৎসরের বালককে এক ঝিহুক পর্য্যন্ত সেবন করান চলে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর পক্ষে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধু উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। মাত্রা ১ বৎসর পর্য্যন্ত এক রতি বা ছই গ্রেনের এক চতুর্থাংশ। ক্রিমির সহিত পেটের দোষ থাকিলে টাটকা কালমেঘের রস ও মধু ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এক্সট্রাক্ট কালমেঘ অপেক্ষা কাঁচা কালমেঘে সত্তাঃ উপকার দর্শে। কালমেঘের বড়ি করিয়া সেবন করাইলেও কাঁচা কালমেঘের মত ফল পাওয়া যায়।

অতীসারে।—সোহাগার খই শিশুর অতীসার নিবারণের মহৌষধ। বাজার হইতে সোহাগা কিনিয়া আগুনে পোড়াইয়া লইলেই খই প্রস্তুত হইবে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে এই খই অর্দ্ধ রতি, একটু চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া প্রাতে একবার করিয়া সেবন করাইতে হয়। অতীসার দোষ অধিক থাকিলে প্রাতে ও বৈকালে ২ বার করিয়াও সেবন করান চলে। ১ বৎসরের পর ৩ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ইহা ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। তাহার পর বয়স বিবেচনায় মাত্রা নির্ণয় করিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতায়।—যষ্টিমধুর গুঁড়া গরম ছপ্পের সহিত সেবন করাইলে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতায়

উপকার দর্শে। ১ বৎসর বয়স্ক শিশুর জন্ম ১ রতি, ঐ হিসাবে মাত্রা বাড়াইতে হয়।

অজীর্ণে।—শিশুর অজীর্ণ দোষ নিবারণের জন্ত এক মাত্র চূণের জলই মহৌষধ। অজীর্ণ নিবন্ধন শিশুর যখন দুধ তোলা রোগ উপস্থিত হয়, তখন ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শিশুর দুধ তোলা রোগে এ ব্যবস্থায় ফল পাওয়া না যাইলে, আম্রকেশী, খই ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে হইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অন্ন-অন্ন লেহন করাইলে উপকার দর্শিয়া থাকে।

চক্ষু উঠা রোগে।—সেওড়ার আটায় কাজল পাতিয়া চক্ষুতে সেই কাজলের অঞ্জন দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

তড়কা। শিশুর তড়কায়ে চৈতন্য সম্পাদনের জন্ত একখানি হরিদ্রা আঙুনে উত্তপ্ত করিয়া কপালে অন্ন তাপ দিলে চৈতন্য সম্পাদিত হয়। যদি ইহাতে চৈতন্য-সংকার না হয়, তাহা হইলে নিশাদল ও চূণ একত্র মিশাইয়া শিশুর নাসিকার নিকট ধরিলে চৈতন্য সংগঠিত হয়। শিশুর তড়কা অনেক কারণে উপস্থিত হয়। অন্ন বেশী হওয়ার জন্য তড়কা হইলে, চোখে মুখে ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ছাট দিবে। দুর্বলতার জন্য তড়কা হইলে কিছু বেশী পরিমাণে রাইসরিষার গুঁড়া গরম জলের সহিত মিশাইয়া, ঐ জলে একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে হাঁটু পর্যন্ত শিশুর পা ডুবাইয়া রাখিবে। এইভাবে ক্রিয়াকাল রাখার পর ময়দা ও রাই সরিষার গুঁড়া একত্র জলে মিশাইয়া লইয়া—শিশুর দুই পায়ের ডিমে উহার পাট বসাইয়া দিবে এবং হাতে, পায়ের ও বগলে আঙুনের সেক দিবে, হাতে, পায়ের ও বুকে গুঁঠের

গুঁড়া মালিশ করিবে। ক্রিমি জন্য তড়কায়ে গরম জল পূর্ণ একটি পাত্রে শিশুর গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখা উপকারী। এরূপ করিয়া আধ হাত উচ্চ স্থান হইতে মস্তকে শীতল জল ঢালিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় শিশু যখন সুস্থ হইবে, তখন দুধের সহিত এরও তৈল সেবন করাইয়া—দান্ত করান উপকারী। সকল প্রকার তড়কাতেই দান্ত পরিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ধনুষ্ঠকারে।—তড়কা নিবারণের জন্য যে সকল উপায় বিধি বলা হইল, সেই সকল উপায় বিধি অবলম্বনে ধনুষ্ঠকারেও ফল পাওয়া যায়। ইহার পর মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত। যে পর্যন্ত স্তন্যপানের শক্তি না জন্মায়, সে পর্যন্ত স্তন্যদুগ্ধ গালিয়া লইয়া কিছুকৈ পূর্ণ করিয়া পান করান কর্তব্য। এই অবস্থায় উদরে শীতল জল সেচন এবং তাপিন তৈল ও এরও তৈল একত্র মিশাইয়া উদরে মালিশ করিলে ফল পাওয়া যায়।

মুখের ঝায়ে।—সোহাগার খই—মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ভেড়ার দুধ লাগান এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

কাণপাকায়।—শিশুর কাণ পাকিয়া পুঁথ নির্গত হইতে থাকিলে গরম জল কিম্বা কাঁচা দুগ্ধ ও জলসহ পিচ্ছুকুরির সাহায্যে কর্ণ ধোত করিয়া তাহার পর উত্তমরূপে উহা মুছাইয়া দিয়া ২১৩ কোঁটা আতর কর্ণ মধ্যে ঢালিয়া দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। ফটুকিরির জলের ফুট দিলে কিম্বা আলতা গরম করিয়া তাহার ফুট দিলেও কাণপাকা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পান দোষ।

(ত্রয়োদশ চক্রবর্তী।)

বে সকল কারণে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতেছে, অধিকাংশ লোকের অস্বাস্থ্যিক পরিমাণে মত্তপানে অভ্যস্ততা তৎসমুদয়ের অন্ততম। কত কাল যাবত যে এ দেশ সুরাকুহকিনীর কুহক জালে সমাচ্ছন্ন, বিশেষজ্ঞগণই তাহা বলিতে পারেন। যাহার মায়ায় তুলিয়া শতসহস্র লোক অহরহঃ অজ্ঞ অর্থ অনায়াসে অপব্যয় করিতেছে,—নানারোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছে, ধর্ম কণ্ঠে অনাসক্ত হইতেছে, সেই সুরা-মায়াধিপায়ী মায়া পাশ ঘথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইলে দেশোন্নতির আশা কিছুতেই করা যাইতে পারেনা।

মানবমাত্রেরই কোন না কোন ধর্মাবলম্বী এবং প্রায় সকল ধর্মশাস্ত্রেই মত্তপান মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে।—

“ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেরং গুরুপত্নীগমনং।

মহাস্তি পাতকাত্মাঃ সংসর্গচাপি তৈঃসহ ॥”

মনুসংহিতা ১১শ অঃ ৫৫ শ্লোক।

“ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন এবং তাদৃশ দোষীদের সহিত সংসর্গ এই পাঁচটি মহাপাতক বলিয়া কথিত হইয়াছে।”

ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির স্থায় সুরাপানও মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় এই যে, শিক্ষিত অশিক্ষিত শতসহস্র হিন্দু জানিয়া শুনিয়া সেই মহাপাপ বহুকাল যাবত করিয়া আসিতেছেন।

ধর্মপুস্তকে মত্তপানের বিধি না থাকিলেও অস্বাস্থ্য ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যেও অনেকেই অনেক দিন হইতে সুধাদ্রমে সুরা-বিষ গলাধঃকরণ করিয়া আসিতেছে। যাহারা ধর্মমত মানে না, মত্তপানরূপ দ্ব্যাকর্ষ্য করিতে ভ্রমেও যাহারা বিরত হয় না, উচ্চ-শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব, ধনবান হইলেও তাহারা কিছুতেই সজ্ঞনের প্রকার-পাত্র হইতে পারে না। যাহারা ধর্মবিরুদ্ধ কৰ্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, কিছুতেই তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সময় বাপন করিতে পারে না।—কখনও তাহাদের—মন, ভয়, সংশয় ও বিবাদশূন্য হয় না।

সজ্ঞান মাত্রেরই সুরাপানের অপক্ষপাতী। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চিকিৎসক গণ রোগবিশেষে ও অবস্থাবাদে পরিমিত মাত্রায় সুরাপানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এ কথা সত্য হইলেও ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, কেহ কোন একটি অভ্যাসের বশবর্তী হইলে, উহা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ সকলেই অভ্যাসের দাস। যদি কেহ পরিমিত মাত্রায় পানাত্যস্ত হয়, তবে সে কল্পিনকালেও উহা ত্যাগ করিতে পারে না। বরঞ্চ ঐ অভ্যাস দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যাহারা পানাসক্ত নহেন, এমন কি সুরা স্পর্শও করেন না এবং যাহারা ব্যবস্থামত পরিমিত ভাবে উহা পানে অভ্যস্ত হন, তাহাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য ইহাই লক্ষিত

হয় যে, প্রাথমোক্ত ব্যক্তিগণ চিরকাল স্বাস্থ্য স্তূথ উপভোগ করেন এবং শেষোক্ত লোকেরা ক্রমে পরিমিত হইতে অপরিমিত মাত্রায় পানাত্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্য, সম্মান, অর্থ ইত্যাদি নষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা বুঝিয়াই অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সকলকেই পানাসক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। চরক সংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—

‘নিবৃত্তঃ সর্বমদ্যোভ্যো নরো যঃ স্তাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শারীরৈর্মর্মানসৈ বীর্মান বিকারৈর্গ সংযুজ্যতে।’

চরক সংহিতা।

“যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বপ্রকার মত্ত হইতে নিবৃত্ত থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি কখন শারীরিক বা মানসিক রোগগ্রস্ত হন না।”

সুরাপানের ঋায় সুরাদান ও গ্রহণও অত্যা। কারণ উহা দান করিলে গ্রহীতাকে এবং গ্রহণ করিলে নিজেকে কিংবা অপরকে পানে প্রলোভিত করা হয়। ইহার ফলে সকলকেই রোগ ধাতনা ভোগ করিতে হয়।

শীতপ্রধান দেশের লোকগণ মত্তপানে বিশেষভাবে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু সেই দেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকবৃন্দ ইহার ঘোর অনিষ্টকারিতা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। চিকিৎসকপ্রবর শ্রীযুক্ত সন্দরীমোহন দাস এম, বি, মহাশয় তাঁহার ‘স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে’ বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের যে সকল যুক্তিপূর্ণ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে ছই চারিটা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

‘সুরা মানুষকে প্রথমতঃ বালকরূপে এবং অবশেষে পশুরূপে পরিণত করে।’

‘পরিমিত মত্তপান পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য না করিয়া বরং বিষ জন্মায়।’

‘কোন মানুষ বলিতে পারে না—কখন সে সীমা অতিক্রম করে। সে আপনাকে পরিমিত পায়ী মনে করিতে পারে, অথচ যে পরিমাণ তাহার দেহ সঙ্ঘ করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক প্রতিদিন পান করিতেছে এবং তাহার দরুণ দেহের কোন অংশ ধীরে ধীরে রোগগ্রস্ত হইতেছে। পরিমিত পায়ীর আপাততঃ বিপদ না হইতে পারে, কিন্তু বিপদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ৮৫ পৃঃ)।

আমাদের দেশের বর্তমান সময়ে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার-কবিরাঙ্গই মত্ত বিষবৎ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া দেশ বিদেশের নীতি শাস্ত্রজগৎও ইহার অনিষ্টকারিতা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাবু জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত ‘হরিদাসী’ উপন্যাস, এদেশে আরও অনেক লেখকের, ও Mr. Hal Cane, Mrs. Henry Wood প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক-লেখিকার উপন্যাস ও Mr. Todd প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা স্পন্দরূপে অবগত হওয়া যায়।

দেশ বিদেশের সজ্জনমাজেই সুরাপানের বিষময় ফল প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ লোক জানিয়া শুনিয়াও কেন যে সেই সুরা অমৃতভ্রমে পান করিয়া প্রকৃত স্তূথে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা মৎসদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সাধ্যাতীত।

এই দৃষ্টিনেও মদ্যপায়ীর সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। গত ১৮১৮ সালে একমাত্র কলিকাতা সহরে যে পরিমাণ মদ্য বিক্রীত হইয়াছে, তাহার মাসিক হিসাব সংবাদ পত্র

হইতে উদ্ধৃত হইল ;—জানুয়ারী—১ লক্ষ ৯ হাজার ৪০০ সের ; ফেব্রুয়ারি—১ লক্ষ ১২ হাজার ১৩০ সের, মার্চ—১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৩৫ সের, এপ্রিল—৮৮ হাজার ৪২৫ সের, মে—১ লক্ষ ৮ হাজার ৮১৫ সের ; জুন—১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৮০ সের ; জুলাই—১ লক্ষ ১২ হাজার ২৫ সের ; আগষ্ট—১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫২৫ সের ; সেপ্টেম্বর—১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৩৫ সের ; অক্টোবর—১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৩৫ সের ; নবেম্বর—১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৫৫ সের ; ডিসেম্বর—১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬৫ সের। এই হিসাব পাঠ করিয়া অত্যন্ত স্থানের বিক্রীত মদের পরিমাণ এবং দেশের কত লোক কু অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই দাঙ্কণ চুক্তির দিনেও যদি লোকের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আর কখন হইবে ?

আমেরিকার প্রায় সকল অঞ্চল সুরা-রক্ষণের করাল কবল হইতে চিরমুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সে সকল স্থানের গরীব অধিবাসীরা (যাহারা পূর্বে মদ্যপানে মত্ত থাকিত) অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। সাধু নিহাল সিং লিখিয়াছেন। 'Wherever alcohol has been banished in America, poverty and dependence upon charity has been reduced. Homes show signs of affluence, the deposits in banks especially saving banks have risen and facilities for education have increased.' (Modern Review, May 1919).

আমেরিকাবাসী যদি বিষয় মদ্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তবে আমাদের দেশের

লোকেরা তাহা পারিবেনা কেন ? সমাজের নেতাদের মধ্যে অনেকেই অনেক কারণে অকারণে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কি মদ্যপায়ীকে ধর্ম ও নীতি বিরুদ্ধাচরণকারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারেন না ? পানদোষ প্রভৃতির বিলোপ সাধন করিতে না করিলে যে সমাজের উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না, তাহা কি ভ্রমেও চিন্তা করেন না ? পানদোষ নিবারণে যদি তাঁহারা বিশেষ যত্নবান না হন, তবে তাঁহাদের সমাজপতি বলিয়া গর্বান্বিত হইয়া যুগ। পানদোষছুট লোকদিগকে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করা তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য।

ত্রিকালজ্ঞ ধর্মবিগণ যাহা অদম্য, অপেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়াছেন, দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও নীতিপরায়ণ লোকগণ যাহার অপকারিতা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পানে ধর্ম, অর্থ, স্বাস্থ্য সকলই লুপ্ত হয়, আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী কর্তৃক যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা—এই সুরা। যাহাতে দেশ হইতে চিরকালের নিমিত্ত বর্জিত হয়, তাহা করা, দেশকল্যাণকামী সকলেরই প্রধান কর্তব্য।

সুরা-কুহকিনীর কুহকজাল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে, দেশ হিতৈষীস্বদের এবিষয়ে সংবাদ পত্রে ছই এক পংক্তি লিখিলে কিম্বা অবসর সময়ে সভা সমিতিতে যৎসামান্য বক্তৃতা প্রদান করিলে চলিবে না। খোস খেয়াল সাহিত্যের উপাসকগণ একাল ও সেকালের কবিদের সমালোচনায়, ভাষা-সংস্কারকগণ বানান সমস্তা

প্রভৃতি বিষয়ে এবং দেশনায়কবৃন্দ স্বায়ত্ত
শাসনের দাবীরূপে আন্দোলনে সমগ্র যাপন
করিলে মদ্যপগণের পানাত্যাস অপনীত
হইবে না, দেশবাসী রোগ, ঐদন্তানিরহাত

হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ইহা নিবারণার্থ
তাহারা সবিশেষ বদ্ববান হন, ইহাই আমার
প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মহীশূরে আয়ুর্বেদ শিক্ষা।—

মহীশূরে আয়ুর্বেদ কলেজের উন্নতি ও সংস্কার
কল্পে মহীশূর গবর্নমেন্ট ব্রতী হইয়াছেন।
তাহারা ঐ কলেজের আরতন বৃদ্ধির জন্য ৭০
হাজার টাকা এবং প্রাথমিক খরচে জন্য ১২
হাজার ১ শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ
ব্যবহার আমরা সুখী হইয়াছি।

নূতন চিকিৎসা প্রণালী।—

“ত্রিপুরা হিতবীতে” প্রকাশ, মেদিনী
পুর জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত
অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এ্যালোপ্যাথিক
ডাক্তার ছিলেন। সম্প্রতি তিনি এ্যালোপ্যাথিক
চিকিৎসা প্রণালী পরিত্যাগ পূর্বক নূতন
প্রণালীতে রোগ চিকিৎসা করিতেছেন।
তিনি কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন না।
তিনি মানসিক ক্রিয়া দ্বারা রোগীর মনে এক
প্রকার শক্তি সঞ্চার করেন। তিনি এই
চিকিৎসা প্রণালীর সাহায্যে—ত্রিপুরা, দিল্লী,
আগ্রার অনেক রোগীকে যোগযুক্ত করিয়া
ছেন। স্বর্গহারা আয়ুর্বেদ পাঠ করিয়াছেন,
তাহারা এ সংবাদে কিন্তু আশ্চর্য্য হইবেন না।

রোগ ও দুর্ভিক্ষ।—ভারতে যেমন
দুর্ভিক্ষ বাড়িয়াছে, সকল প্রকার রোগও
তেমনি সমগ্র ভারত জুড়িয়া বলিয়াছে।

ফলতঃ খাদ্য দ্রব্যের দুর্শ্মল্যতা নিবন্ধন ভারত-
বাসী যথোপযুক্ত আহার্য্য না পাওয়াই ভারত-
বাসীর রোগ বৃদ্ধির কারণ বলিয়া আমরা মনে
করি। সহযোগী “হিন্দুস্থান” গত ২৯শে
শ্রাবণের সংখ্যায় “কি ছিল, কি হইয়াছে!”
শীর্ষক প্রবন্ধে একশত বৎসর পূর্বে, ৬৬ বৎসর
পূর্বে এবং ৩০১৩ বৎসর পূর্বে আমাদের
দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল, নজীরসহ
সাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়,
একশত বৎসর পূর্বে বালাম চাউলের মৌন
১১০/০ ছিল, উত্তম গব্য ঘৃত ২০/ ছিল, মাংসারি
গব্য ঘৃত ১৬/ টাকায় বিক্রীত হইত, ভয়েসা
ঘূতের মৌন ছিল ১৬/। ৬৬ বৎসর পূর্বে
চাউলের মৌন ছিল ১০/০, কলাইয়ের মৌন ছিল
১০/০ আনা, ৩০১৩ বৎসর পূর্বে চাউলের মূল্য
ছিল টাকায় অর্দ্ধ মৌন, খাঁটি সরিষার তৈলের
মূল্য ছিল চারি আনা সের। গব্য ঘৃত তখনও
টাকায় পাঁচ পোয়া দরে এবং খাঁটি দুগ্ধ টাকায়
ঘোল সের দরে বিক্রীত হইত। এখন লোকে
আগের অপেক্ষা অর্থ উপার্জন অনেক বেশী
করিতেছে বটে, কিছু দুর্শ্মল্যতা নিবন্ধন পর্য্যাপ্ত
খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমাদের
দেশের রোগ বৃদ্ধির সকল কারণগুলির মধ্যে
ইহাই যে সর্বপ্রধান—ইহা নিশ্চিত রূপে বলা
বাইতে পারে।

আয়ুর্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬—কার্তিক।

২য় সংখ্যা।

বঙ্গে বিজয়া।

(শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত)

থেমে গেল কোলাহল, শাস্ত্র পল্লীগুলি,
নগরী মুখরী পুনঃ তুলি' শত বুলি।
কর্ম্মগত জীব পুনঃ করমে মগন,
বিশ্ববাসী পুনঃ যেন আগেরি মতন।
ক্ষীণ কণ্ঠে আলাপন তাই 'সাহানার'—
জানাইছে দিন ওগো আজি বিজয়ার।

(কিন্তু) কে বিজিত—কে বিজেতা? বঙ্গে তা' তো নাই,

কিসের আনন্দ তবে আজি মোরা পাই?

'রামের' বিজয়োৎসব 'রাবণ' নিধনে,—

মোদের বিজয়োৎসব 'রোগে'র পীড়ণে!

লেলিহান লোল জিহ্বা বিস্তারি' রম্ভনা—

গ্রাসিতেছে 'ম্যালেরিয়া' বিকট বদনা।

'ইনফ্লুয়েঞ্জা' ভয়ঙ্করী নাশিতেছে বঙ্গ,

'কলেরা বসন্ত' আসি' করিতেছে বঙ্গ!

কত শিশু অকালেতে ছাড়িছে ধরণী,
 ‘যক্ষ্মা’য় মরিছে কত যুবতী ঘরণী।
 বঙ্গবাসী মরে যত—এমন মরণ
 কোনো দেশে কোনো কালে হয়না কখন।
 রোগের বিষম জ্বালা দৈত্য অবতংস,
 কেবা আশ্রয়ান বল করিবারে ধ্বংস ?
 তবে কেন বিজয়ার বাজিবে বাজনা ?
 বিজয়া নাহিক বঙ্গে—কেবল বেদনা !
 বিজয়া উৎসবে মত্ত হইব তখন,
 রোগাত্মর দেশ হ’তে যাইবে যখন।

কাজের কথা ।

বাস্তালায় ব্যাধি—সোণার বাস্তালা
 শাশান হইতে বসিয়াছে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার
 অসংখ্য লোক মরিতেছে, সহরে যক্ষ্মায় যথেষ্ট
 লোকক্ষয় ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া প্লেগ, কলেরা,
 বসন্ত প্রভৃতি সাময়িক ব্যাধিতে লোকক্ষয়
 তো আছেই। তাহার উপর গত বৎসর ইনফুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া নামক
 দুইরকম ব্যাধি করাল-বদনবাদ্যানে যেরূপ অগণিত
 লোকক্ষয় করিয়াছে, তাহাতে উহার পুনরাক্রমণ
 ঘটিলে সত্য সত্যই বাস্তালা দেশ যে শাশান
 সদৃশ হইয়া পড়িবে, ইহা অনিশ্চিত। ফল
 কথা বঙ্গভূমি যেরূপ ব্যাধিপ্রবণ হইয়া
 পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের সকল চিন্তা
 অপেক্ষা সৰ্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রধান
 কর্তব্য। দেশ রক্ষার অধিনায়ক—সরকারী
 স্বাস্থ্য কর্মচারিগণ অবশ্য একান্ত বিশেষ চিন্তা

করিতেছেন, কিন্তু শুধু তাঁহাদের চিন্তায়
 নির্ভর করিলে চলিবে না,—প্রত্যেক দেশ-
 বাসীকেই ইহার প্রতীকারকল্পে সচেতন হইতে
 হইবে।

উপায় চিন্তন—প্রতীকারকল্পে সচেতন
 হইতে হইলে বাঙ্গালীকে সর্ব প্রথম
 সংযমব্রত শিক্ষা করিতে হইবে। সেই সংযম
 ব্রত শিক্ষার অভাবেই তো বাঙ্গালার সর্বনাশ
 ঘটিতেছে, ইহা নির্ভাঁজ সত্য কথা। বাঙ্গালীর
 ছেলেকে হাতে খড়ি দেওয়ার পর হইতে
 তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিভূষণে
 ভূষিত করিবার জন্য বাঙ্গালীজনক যেরূপ
 চেষ্টাশীল হইয়া থাকেন, তাহাকে সংযমব্রত
 শিক্ষা দিবার জন্য সেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন
 কি? স্কুল কলেজেও যেরূপ শিক্ষা দিবার

ব্যবস্থা, তাহাতে সেখানেও সেরূপ কোনো শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত নাই! কাজেই বাঙ্গালী সংযমী হইবে কেমন করিয়া! বাঙ্গালী বিদ্যো-পার্জন করে—অর্থ উপার্জনের জন্য,—জ্ঞান-ার্জনের কামনায় বা সংযমী হইবার আকাঙ্ক্ষায় বাঙ্গালী বিদ্যা শিক্ষা করে না,—কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার মূল যে ধর্ম প্রবণতা—বাঙ্গালী তাহা মানিতে পারে না, বাঙ্গালীর রোগবাহুল্যের কারণই ইহাই।

* * *

অনুকরণে অনিষ্ট—বাঙ্গালী-বালক প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতে কোনো ধর্মমূলক শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ তো প্রাপ্ত হয়ই না, তা' ছাড়া অনুকরণে অনিষ্ট উৎপাদন করিবার শিক্ষাটি বাঙ্গালী-বালক নানা প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী-পিতা প্রাতে স্নানাহ্নিক করিবার পূর্বেই গরম গরম চায়ের পেয়ালা লইয়া নিস্তেজ দেহধানিকে ক্ষণেকের জন্য সবল করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালী-শিশুটিও তাহার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয় না। চায়ের মত উগ্র দ্রব্য ব্যবহারে ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে উপকার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ যে গ্রীষ্মের উর্বর ভূমি,—এদেশের লোকের পক্ষে চায়ের মত উগ্র দ্রব্য ব্যবহারে পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যত্যয় স্বভাবতঃই হইবার কথা। বাঙ্গালী-পিতা বহুকালজাত মোতাতে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, জানিয়া শুনিয়াও তাহার পক্ষে আর এ নেশার হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইবার উপায় নাই—বাঙ্গালী-শিশুও কিন্তু সে কথা শুনিল না,—তাহাকে সে কথা কেহ বুঝাইলও না,—ফলে সাহেবদের অনুকরণে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চায়ের মত দ্রব্য প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীর যে কি সর্বনাশই

করিতেছে তাহা বুঝাইতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া পড়ে!

আহারে স্বাস্থ্যপালন—আহারের সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধ যে অসংবদ্ধ, সে কথা আমরা অনেক বারই বলিয়াছি। বাঙ্গালী যখন সে কথা মানিত, তখন বঙ্গভূমি রোগের আকরভূমি হয় নাই। অর্থাৎ যাহা যে স্বস্থবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, বাঙ্গালী আগে তাহার প্রত্যেক বিষয় পালন করিত। প্রাথমিক স্নান পূজা আহারিক ব্যবস্থায় যে স্বতঃই স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে, এ কথা কি এখনকার বাঙ্গালী মানিতে চাহেন? আগেকার বাঙ্গালী কিন্তু স্নানাহ্নিকে দেহ ও চিত্তশুদ্ধি না করিয়া কোনো দ্রব্য আহার করিতেন না। প্রাথমিক স্নান ও পূজা আহারিক সমাপনের পর বাঙ্গালীর যে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান দ্রব্য থাকিত—আদা ও ছোলা ভিজা,—এ কথা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। ফলে আদায় ক্ষুধা বৃদ্ধির কার্য করিত, পাকস্থলীর ক্রিয়া সুপরিষ্কৃত হইত; আর ছোলাভিজা ভক্ষণে পিত্ত প্রশমনের কার্য করিত। তাহার পর মাধ্যাহ্নিক আহারেও বাঙ্গালী যে সকল দ্রব্য আহার করিত, তাহার মধ্যে দুগ্ধ ঘৃতাদি পুষ্টিকর খাদ্যসকলের ব্যবস্থা থাকিত। এখন সে দুগ্ধ ঘৃতাদি একরূপ দুগ্ধাপাই হইয়া পড়িয়াছে অনেকের ঐ দুইটি দ্রব্য খাইবার প্রবৃত্তিও নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী এখন সুর্য্যোদয় হইতে না হইতেই শয্যা ত্যাগের পূর্বেই চায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত, মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় দুগ্ধ ঘৃতির পরিবর্তে কতকগুলি অসার দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত! তাহার উপর বাঙ্গালী ধর্ম শিক্ষা বর্জিত,

কাজেই চিত্তসংযমেও তাহার শিক্ষা নাই, সকল দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালী অধিক রোগ-প্রবণ হইবে না তো হইবে কাহার? সকল দেশের লোকের অপেক্ষা বাঙ্গালীর মৃত্যুও তো এই জন্য অধিক।

ব্রহ্মচার্য্য পালন—ইহার উপর বাঙ্গালীর ব্রহ্মচার্য্যপালনের শিক্ষা একেবারেই নাই। চিত্ত সংযমের শিক্ষা বাঙ্গালী প্রাপ্ত হয় নাই, কাজেই ব্রহ্মচার্য্যপালনের শিক্ষা সে পাইবে কোথা হইতে? ফলে ব্রহ্মচার্য্যপালনের শিক্ষা না থাকায় “মরণং বিন্দুপাতেন”—এ কথা বাঙ্গালী এখন আর মানিতে চাহে না। পূর্বে বাল্যজীবনে তো ব্রহ্মচার্য্যপালনের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবেই পালন করা হইত, তা’ছাড়া পরিণত বয়সেও তিথি-নক্ষত্র দেখিয়া, পূর্ণদিন বাছিয়া তবে স্ত্রী-পুংমিলনের ব্যবস্থা হইত। এখন সে ব্যবস্থা একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যে ফুসফুসের পীড়ায় সকল পীড়া অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহার একমাত্র কারণই সংযমের অভাব। একে পুষ্টিকর আহাৰ্য্য বাঙ্গালী আহাৰ্য্য করিতে পায় না, তাহার উপর শুক্রক্ষয় জনিত অসংযমী বাঙ্গালীর পাকস্থলীর ক্রিয়া সহজেই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেই পাকস্থলীর ক্রিয়ার বিকৃতির ফলেই বাঙ্গালীর হৃদপিণ্ড দুর্বল হইয়া বাঙ্গালীর দেহ নানা রোগের আকার ভূমি হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী যতদিন এ সকল কথা না বুঝিবে, ততদিন যে বাঙ্গালীর মঙ্গল নাই—ইহা স্তূনিশ্চিত।

বাঙ্গালী রমণী—বাঙ্গালী-রমণীদিগের

স্বাস্থ্যও নানা কারণে ভয়প্রবণা হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী-পুরুষের চিত্তসংযমের শিক্ষা নাই, কুসুম কোমল প্রাণা মহিলা জাতি সে শিক্ষা পাইবে কোথা হইতে? তাহার উপর এখনকার বাঙ্গালী-পুরুষ নিজেদের বাবুয়ানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে গিয়া তাঁহাদের অঙ্কলক্ষ্মীদিগকেও এক একটি আদর্শ বিলাসিনী গড়িয়া তুলিতেছেন। তাহারই ফলে বাঙ্গালী-মহিলাগণ একেবারে শ্রম-বিমুখা হইয়া পড়িতেছেন। পূর্বেকার বাঙ্গালী-রমণীগণ শ্রমবিমুখা ছিলেন না, তাঁহারা অতি প্রত্যাষে শয্যা পরিত্যাগের পরেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম সকলে মনোভিনিবেশ করিতেন। সেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম সম্পাদনেই তাঁহাদের পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-রমণীকেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম নির্বাহ করিতে হয় না,—দাস-দাসীতে সে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহার উপর নাটক নবেলের মত আদিরস ঘটিত পুস্তকগুলি পাঠে চিত্ত সংযমের প্রবৃত্তি তাঁহাদের একেবারেই তিরোহিত হইয়া থাকে। ফলে আলস্ত-পরতন্ত্রতাই এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-রমণীর যে স্বাস্থ্যহানির কারণ—ইহা অবিসংবাদিত—সত্য কথা। কিন্তু বাঙ্গালী-পুরুষ এ সকল কথা না বুঝিলে বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করিবার উপায় কিছুতেই হইবে না।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

—:—

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম এ, এল, এম্. এস্.)

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

(ক) অগস্ত্য সংহিতা—মহর্ষি অগস্ত্য ইহার প্রণেতা বলিয়া কথিত। বঙ্গসেন বলেন, এই গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি তাঁহার সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার প্রসঙ্গেও অগস্ত্য সংহিতার বিষয় লিখিত হইবে।

(খ) কৌপালিক তন্ত্র—ইহা কৌপালিকের রচিত শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ।

অশ্ব, গজ ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন সংহিতা ছিল। তন্মধ্যে তিন খানির পরিচয় লিখিত হইতেছে।

(১) শালিহোত্র সংহিতা। ইহা অশ্ব-চিকিৎসার গ্রন্থ এবং এক্ষণে ছল্ভ হইলে ও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে আরবেরা এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া “শালাটোর” নাম দিয়াছিল। এই সংহিতা অবলম্বনে লিখিত নকুলকৃত এবং জয়দত্তস্বরিকৃত “অশ্ববৈজ্ঞক” এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) পালকাপ্য সংহিতা। ইহা হস্তি চিকিৎসা বিষয়ক সূমহান গ্রন্থ। ইহা পুণ্যপত্তনের আনন্দাশ্রমের অধ্যক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান পালকাপ্য মুনি অঙ্গাধিপ রোমপাদ নৃপতিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) গৌতম সংহিতা—ইহা গো-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে ছল্ভ হইয়াছে।

বৃক্ষায়ুর্বেদ—বৃক্ষায়ুর্বেদ সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ এখন কিছুই পাওয়া যায় না। শাঙ্গধর কৃত সংগ্রহের “উপবন বিনোদ” নামক অংশ বৃক্ষায়ুর্বেদ বিষয়ক। তদ্ব্যতীত অগ্নিপুராণ, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্বেদের অতি অসম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার—আর্য্যগণের বিহার ক্ষেত্র আর্য্যাবর্তে আয়ুর্বেদের এইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাপথেও আর্য্যগণ কর্তৃক আয়ুর্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের অনুমান হয়, ভরদ্বাজ ঋষি ইজের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া মর্ত্ত্যে প্রচার করিবার পর আত্মের আর্য্যাবর্তে এবং অগস্ত্য দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার করেন। মতান্তরে অগস্ত্য ধনন্তরির শিষ্য বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। অগস্ত্যপ্রণীত অগস্ত্য সংহিতা এবং তদানুসারী ‘অগস্ত্যসম্প্রদায়’ নামক চিকিৎসকগণ এক সময়ে দক্ষিণাপথে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য্য কোন মতে ১৮ জন, কোন মতে ২২ জন এবং কোন মতে ৪৪ জন। ইহার সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে এখনও পাওয়া যায়। পরে গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে উহাদের বিষয় লিখিত হইবে।

মহর্ষি অগস্ত্য কতকাল পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কেহ

কেহ ইহাকে রামায়ণে কথিত অগস্ত্য বলিয়া নির্দেশ করেন*।

এই আৰ্যযুগ বা সংহিতা যুগকে আয়ুর্বেদের মধ্যযুগ বলি যাইতে পারে। এই সময়ে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অত্যাচ্ছন্ন দেশ ভারতীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়েই আৰ্য্যাবর্ত বহিষ্কৃত অনেক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নানা দেশে গিয়া ভারতীয় জ্ঞানালোক ছুটা উন্মেষিত করিয়াছিলেন—বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংগ্রহকাল—কালক্রমে আৰ্য্যজ্যোতিঃ ক্ষীণ হইতে আৰ্য্যজ্ঞানধিকারী নবাবুদ্ভূত বৌদ্ধাচার্য্যগণ নূতন ধর্মপ্রচারের সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাদেশের নানা দূরদূরান্তর প্রদেশে ভারতীয় জ্ঞান সম্পদ বিতরণ করেন। এইরূপে আরবদেশ, মিশ্রদেশ (ইজিপ্ট), গ্রীস, রোম, চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ ক্রমে ভারতীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতগণ যে যুরোপের গুরুস্থানীয় তাহা পাশ্চাত্যগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ যে সাংখ্য সংস্কৃতি বা পরম্পরাক্রমে ভারতের শিষ্য—ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কি পরিতাপের বিষয় যে যুরোপের গুরু গুরু সেই ভারতবর্ষ আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নানা বিষয়ে যুরোপের নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছে। কিন্তু আমরা পরে ইহাও দেখাইব যে, আয়ুর্বেদের অনেক তত্ত্ব আজও পাশ্চাত্যগণের অবিদিত ও শিক্ষণীয়।

আরবদেশীয়গণ যে ভারতবর্ষীয়দিগের

নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, “অলবরণ প্রণীত আরবদেশীয় ইতিহাসে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী “হরুণ-উল-রসিদেব” রাজত্বকালে ‘শরক’ (চরক), ‘সমুদ’ (সুশ্রুত), ‘নেদান’ (নিদান) এবং অগদত্ত্ব ও কোমারভূতাদি বিষয়ক অত্যাচ্ছন্ন গ্রন্থ আরব ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ‘মজ্জ’ নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক উক্ত যবন সন্ন্যাসীকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আয়ুর্বেদের অনুগ্রহেই সৌশ্রুত মতানুযায়ী বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা, সিরাবেধ প্রণালী, সিরাবেধের বহুল প্রচার, মরিচ, যষ্টিমধু, লাক্ষা, গুগগুলু প্রভৃতি ভারতীয় ঔষধের বহুশঃ প্রয়োগ এখনও যাবনিক বা যুনানী চিকিৎসা-শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেও আয়ুর্বেদের বাজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ‘ইৎসিঙ্গ’ নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক বলেন, আয়ুর্বেদের বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায়, ভারতীয় বহু ভেষজও চীনদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে আয়ুর্বেদের বহুল প্রচার হইবার পরে, সংগ্রহকালে কিরূপে আয়ুর্বেদের অবনতি ঘটিয়াছিল এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে প্রতिसংস্কর্তা, সংগ্রহকার ও টীকাকারদিগের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে উহাদিগের বিস্তৃত পরিচয় লিখিত হইবে।

* দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচার সম্বন্ধে মাস্ত্রাজ নিবাসী আয়ুর্বেদাচার্য্য মহাশয়ের বৈদ্যরত্ন পণ্ডিত ডিঃ গোপালচাঁদ মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিষয়ে অনেকসংবাদ পাইয়াছি, সেজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কালক্রম দুর্দ্দৈববশে চিরন্তন বৈদিক আচার গৌরব হীমমান হইলে ভারতপ্রভাকর বৌদ্ধ হৃদ্দিনাচ্ছন্ন হইয়া ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়াছিল। সেই সময়ে অকালবজ্রনির্ঘাতের গ্রায় জ্ঞানার্জনবিয়ভূত শক, হুণ এবং যবনাদি জাতির উৎপাত আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ট জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্বে গ্রীসদেশীয় সম্রাট “অলিকসন্দর” ভারত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে দেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। হুর্ভিক্ষ এবং গৃহ দাহবশতঃ অসংখ্য প্রজা ও বহু গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। “অলিকসন্দর” স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে “সেলুকস্” নামক গ্রীকবীরকে বিজিত দেশ শাসন করিবার জন্ত রাখিয়া যান। সেলুকস্ ভারত হইতে বিবিধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ বহু চিকিৎসাগ্রন্থ স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ও তাঁহার প্রভু অলিকসন্দর উভয়েই ভারতীয় চিকিৎসানৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেলুকস্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে “মিগস্থিনিস” নামক গ্রীকচিকিৎসককে ভারতীয় বিদ্যাশিক্ষার জন্ত চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া যান। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, গ্রীকগণ ভারত হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং তৎপুত্র বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে তদানীং ক্রুরপ্রকৃতি অশোক বহু রাজপুত্র এবং রাজবংশীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল হইতে তিনবৎসর পর্যন্ত ভীষণ অন্তবিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ প্রজা বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে শত শত অমূল্য গ্রন্থও নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনন্তর উপগুপ্ত নামক

বৌদ্ধাচার্য্য কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া অশোক পরম ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি চীন গ্রীসাদি বহু দূরদেশে বৌদ্ধ শ্রমণগণকে প্রেরণ করিয়া সেই সকল দেশে ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোক বিতরণ করেন। চিকিৎসা বৌদ্ধগণের একটা প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। অতএব সে সময়ে আয়ুর্বেদ কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হইলেও উহা যে পরহিতব্রত শ্রমণগণ কর্তৃক যবনাদি দেশে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে রাজাজ্ঞায় শবব্যবচ্ছেদাদি নিষিদ্ধ হওয়ায় শারীরশাস্ত্রেরও বিশেষ অবনতি খটিয়াছিল।

অনন্তর মৌর্য্যাবংশ হীন পরাক্রম হইলে (১৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে) ‘পার্শ্ব’ নামক গ্রীক জাতি এবং শক নামক বর্ব্বর জাতি পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধু নদ হইতে সাকেতপুর পর্যন্ত দেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়া ছিল। এই সময়ে ‘মিলিন্দ’ নামক জনৈক গ্রীক পঞ্চনদ প্রদেশ জয় করিয়াছিল। মগধ দেশে সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র মৌর্য্যাবংশীয় বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়া ছিল। নিরন্তর এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ায় সে সময়ে সমস্ত আৰ্য্য শাস্ত্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল।

পুষ্পমিত্র রাজা হইবার পরে কিছু দিনের জন্ত দেশব্যাপী বিপ্লব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া ছিল। এই সময়ে ভগবান পতঞ্জলি বিশীর্ণ প্রায় অগ্নিবিশ সংহিতার প্রতिसংস্কার করিয়া ছিলেন। আমরা পরে দেখাইব যে, এই পতঞ্জলিই চরক নামে বিখ্যাত। বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জুনও এই সময়ে সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল।

শকজাতি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া ভারতীয় রাজগণ হানিবল হইলে কুশাগবংশীয় কনিষ্ক নামক মহা প্রতাপ শকনরপতি হিমাচল হইতে বিদ্যাগিরি পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। ইহার পর তিন শত বৎসর দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল এবং কান্দীর দেশীয় দৃঢ়বলাচার্য্য তাহার পূরণ করেন।

ইহার পর পঞ্চপালের ছায় বহু সংখ্যক হুণ ও শক সৈন্য ভারত আক্রমণ করিয়া বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। ইহার কিছুকাল পরে খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৭ অব্দে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য শকদিগকে জয় করিয়া উজ্জয়িনী হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন। এই সময় হইতে প্রায় পঞ্চ শত বর্ষকাল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তৎপুত্র নরপতি দিগের শাসন কালে বিপ্লব-বিশীর্ণ ভারতীয় জ্ঞান পুনরায় কথঞ্চিৎ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কালিদাস প্রমুখ কবিগণ ও আর্য্যভট্ট প্রমুখ জ্যোতির্বিদগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পরে পঞ্চশত বৎসরের মধ্যে বাগ্‌ভট্টাচার্য্য, বৃন্দ ও মাধব নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থের সংগ্রহকারগণ এবং জৈয়ট, গয়দাস, ভাস্কর ব্রহ্মদেব প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে চরকসূত্রের টীকাকার ও সংগ্রহকার চক্রপাণি এই সময়ের মধ্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১০৪০—১০৫০) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। স্তুরাং চক্রপাণি ভারতীয় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পুনরভ্যুদয় কালের শেষ সময়ের আচার্য্য। মালবের নানাশাস্ত্রবিদ ভোজ নামক প্রসিদ্ধ রাজা ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত ‘রাজমার্কণ্ড’ প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ এবং ‘পাতঞ্জলবৃত্তি’ নামক দার্শনিক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

ইহার পর ভারতের দ্বিতীয়া বশতঃ মুসলমানদিগের ঘোর আক্রমণ প্রবাহ চলিতে থাকে। পূর্বে মহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্থায়ী বা অধিক ক্ষতিকর হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে বহু সহস্র সৈন্য লইয়া মহম্মদ গজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাহার ফলে সোমনাথ পত্তনাদি স্থানের অমূল্য সম্পদ লুপ্তিত, তীর্থস্থান সমূহের দেবমূর্তি বিচূর্ণিত ও সহস্র সহস্র প্রজার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। গজনীর সৈন্যগণ এই সময়ে প্রতিদিন শত শত গৃহ ও সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন সংহিতাদি ভস্মীভূত করিয়াছিল। লোকে ধন-প্রাণধর্ম্ম রক্ষার জন্ত ব্যাকুল হইয়া জ্ঞানার্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহম্মদ গজনী লুণ্ঠন কার্য্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার অল্পদিন পরেই স্বদেশদ্রোহী জয়চন্দ্র কর্তৃক আহৃত হইয়া মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষত্রকুলস্থর্য্য দেহলীপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পর দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে আলতামাস্ এবং আলাউদ্দীন মালব ও দাক্ষিণ্যপথের কিয়দংশ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আক্রমণ স্থান হইতে দূরে থাকায় বঙ্গদেশ এই সময়ে বিশেষ বিপর্য্যস্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে নিদানসংগ্রহকার মাধব কর এবং একাদশ

শতাব্দীতে চক্রপাণি প্রাজ্ঞত্ব হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান বিপ্লব আরম্ভ হইলেও টাঁকাকার বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ আয়ুর্বেদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আবার উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের সময়েও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া খাইত। ইহার পরে বঙ্গদেশও মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত ও বিবরস্ত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিস খাঁ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়া হিচামল হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন এবং বহু প্রজার প্রাণবিনাশ করিয়াছিল। চেঙ্গিস খাঁ প্রতি নিবৃত্ত হইলেও পুনঃ পুনঃ সমাগত মোগলদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তৈমুরলঙ্গ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ দুই মাস ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং অসংখ্য প্রজার গৃহদাহ ও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মহাবিক্রান্ত বীরবৃদ্ধ বা বুক নামক রাজা বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সভাসদ সারণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য দ্বারা বেদের উদ্ধার ও ভাষ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শাঙ্গ ধর নামক আয়ুর্বেদীয় সংহিতাকার এই সময়ে (১৪২০ সন্থতে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে মোগল নরপতি বাবর পাঠানদিগকে জয় করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে বাবরের পুত্র হুমায়ুনের দিগ্বিজয় উপলক্ষে দেশে বিধ্বংস বিপ্লব ঘটয়াছিল। অনন্তর হুমায়ুন শেরশাহ নামক পাঠানরাজ কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে

ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত মোগল ও পাঠান জাতির মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতের ধন, প্রাণ ও বিদ্যার যথেষ্ট হানি হইয়াছিল।

ষোড়শ বর্ষ পরে হুমায়ুন পুনরায় যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্র আকবর শাহ স্বীয় বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রথমে বহু প্রজা ও দেশ ধ্বংস হইলেও শেষে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। আকবর শাহ ভারতীয় শাস্ত্র ও পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন। এই সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রসিদ্ধ সংগ্রহকার ভাবমিশ্র কাল্পকুঞ্জ প্রাক্তন হইয়াছিলেন।

আকবরের পৌত্র ঔরঙ্গজেব রাজ্য লাভ করিবার পর দেশে বিধ্বংস বিপ্লব ঘটয়াছিল। হিন্দুদেবী ঔরঙ্গজেব শত শত দেব মন্দির চূর্ণ করিয়া সহস্র সহস্র গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া এবং অসংখ্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজার প্রাণবধ করিয়া ভারতের বিধ্বংস অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যা ইতিপূর্বে কথঞ্চিৎ উজ্জীবিত হইলেও এই সময়ে পুনরায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আয়ুর্বেদও এই সময় হইতে যবন চিকিৎসকগণ কর্তৃক হতসর্বস্ব হইয়া কোন রূপে জীবন ধারণ করিয়াছিল।

ইহার পর ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে আমেদ সাহ আবদালী কর্তৃক ভারতভূমি উপযুপরি চারিবার আক্রান্ত হয়। এই সকল আক্রমণের ফলেও অসংখ্য প্রজার প্রাণ নষ্ট হয় এবং বহুজনগণ শয্যানে পরিণত ও বহু ধনরত্ন ও গ্রন্থরত্ন অপহৃত ও বিনষ্ট হইয়াছিল।

আর্যযুগের পরবর্তী সময় হইতে ভাষা-মিশ্রের সময় পর্যন্ত কালকে সংগ্রহকাল বলা যাইতে পারে। ইহা আয়ুর্বেদের অথবা ভারতের সমস্ত বিদ্যার অপরাহ্ন কাল। এই সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা অস্বাধিক খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাইত এবং সেই সকল গ্রন্থের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনর্যোজনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

অবনতি কাল—সংগ্রহকালে আয়ুর্বেদের অনেক অবনতি ঘটিলেও প্রতিসংস্কারক, সংগ্রহকারক এবং টীকারদিগের চেষ্টা বশতঃ সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে নাই। অপিচ টীকারদিগের সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা স্থলভ ছিল, সে কথা বলা হইয়াছে। এই জন্ত সংগ্রহকালের পরবর্তী কালকেই আমরা অবনতিকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

অবনতিকালে প্রাচীন সংহিতা সকল ছল্লভ হইয়া পড়ে এবং যে সকল সংগ্রহ অবশিষ্ট থাকে সেগুলি বহু ভ্রম প্রমাদের আকর হইয়া উঠে। অপিচ, সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠন ত্রাস পাওয়ায় আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যাও কম হইতে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব বশতঃ লোকে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে যে সকল চিকিৎসাগ্রন্থ পূর্ক পুরুষগণের পরম আদরের ধন ছিল, তাঁহাদের সম্মান সম্মতির নিকট সেই সকল গ্রন্থ আবর্জনার মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ অনাদরেও কত গ্রন্থ রত্ন যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ক্রমে অনুচিত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ চিকিৎসকগণ রোগীর মলমূত্র-পুণ্ড-রক্তাদিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে

বৃত্তিক্রিয়া লোপ পায়, শস্ত্রচিকিৎসা কৌরকার দিগের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় ও প্রস্তুতি-বিদ্যা নীচ জাতীয়া জীলোকের হস্তে সমর্পিত হয়।

পূর্কই বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধযুগ হইতেই রাজাজ্ঞায় শবব্যবচ্ছেদ প্রথা রহিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বশতঃই ইউক অথবা পরবর্তী কালে নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ হেতু দেশে মহান্ বিপ্লব ঘটবার কালেই ইউক, ভারতীয় রাজগণ বা জনসাধারণ শব ব্যবচ্ছেদ প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্ত চেষ্টা করেন নাই। বিজেতা মুসলমান রাজগণেরও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে শবব্যবচ্ছেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক শারীর তত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়েন। এইরূপে শারীর জ্ঞান বর্জিত চিকিৎসকের সংখ্যার আধিক্য বশতঃ আয়ুর্বেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

পূর্কই হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে দেশে দেশে আরোগ্যশালা (Hospital) প্রতিষ্ঠিত ছিল বৌদ্ধযুগের পরবর্তী সময়ে মুসলমান বিপ্লবের কালে সেই সকল আরোগ্যশালা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরোগ্যশালায় কর্ম্মাভ্যাস ব্যতীত চিকিৎসাবিদ্যার সম্যক পারদর্শিতা জন্মে না। কোন চিকিৎসকবিশেষের নিকট থাকিয়া কর্ম্মাভ্যাস করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সেই চিকিৎসকের আয়ত্ত বিদ্যা ব্যতীত, আয়ুর্বেদের সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় না। এই কারণেও ইদানীং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্কই বলা হইয়াছে সংগ্রহকালেই বাবনিক

চিকিৎসায় প্রাধান্য ঘটে। আয়ুর্বেদের অবনতিকালে মুসলমান রাজার আদরাতিশয়ে যাবনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রসার ঘটে এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন অত্যন্ত কমিয়া যায়। এমন কি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ আয়ুর্বেদের পরিবর্তে রাজকীয় ঘনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। সেই জন্ত উত্তর ভারতে এখনও ঘনানী চিকিৎসা বহুসমাদৃত।

এইরূপে ক্রমে গ্রন্থ লোপ, ভিন্ন ভিন্ন অংশের অপ্রচার, পঞ্চকন্দাদির বিলোপ, সংস্কৃত ভাষা আলোচনার নূনতা প্রভৃতি নানা কারণে আয়ুর্বেদ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বর্তমান সময়কে আয়ুর্বেদের পুনরুদ্যমের সূচনাকালও বলা যাইতে পারে। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের পরে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যার এবং বিপ্লবপীড়িত প্রজার উদ্ধারের জন্তই যেন বিধাতা কৃপা করিয়া উদারহৃদয় ইংরাজ জাতিকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন শূণ্যে এক্ষণে প্রজার ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ এবং জ্ঞান অর্জনের পথ বিঘ্নশূন্য। এখন ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যা ও কীর্তির রক্ষার্থে ও উন্নতি কল্পে ব্রিটিশরাজ মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতেছেন। বিধম ছদ্দিনের পর ভারতে আবার সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। বহুদিনের পর ভারতের নানা স্থানে আয়ুর্বেদের একটা নূতন জাগরণ দেখা যাইতেছে।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থপরিচয় ।

পূর্বে অনেকগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিশিষ্ট

গ্রন্থকারদিগের এবং গ্রন্থ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইতেছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্ত প্রথমে বর্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের পরিচয়—(ক) প্রতिसংস্কারক (খ) সংগ্রহকারক ও (গ) টীকাকার—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিত হইবে। (সংহিতাকারগণের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।) পরে গ্রন্থ পরিচয়—(ক) সংহিতাগ্রন্থ (খ) সংগ্রহ গ্রন্থ, (গ) রস গ্রন্থ, (ঘ) নিবন্ট গ্রন্থ ও (ঙ) বিবিধ সংগ্রহ—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত হইবে। অপ্রধান গ্রন্থকারদিগের পরিচয় গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, মূল সংহিতার পরে আর কোন নূতন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কেহ প্রাচীন সংহিতার প্রতिसংস্কার করিয়াছেন, কেহ বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগ্ৰহ করিয়া বিবিধ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ টীকা করিয়াছেন। - অতএব গ্রন্থ ও গ্রন্থকার শব্দ গ্রন্থলোপাণ ভাবেই প্রযুক্ত হইল বোধিতে হইবে। সুতরাং গ্রন্থকার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রতिसংস্কর্তা প্রভৃতির এবং গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে প্রতिसংস্কৃত ও সংগ্রহ গ্রন্থাদির পরিচয় লিখিত হইতেছে। তবে বৌদ্ধযুগে অনেক নূতন রসগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

গ্রন্থকার পরিচয় ।

(ক) প্রতिसংস্কারকগণ ।

চরক—ইতি অগ্নিবৈশেষ্যের প্রতिसংস্কারক। প্রতिसংস্কৃত অগ্নিবৈশেষ্য-সংহিতার বা চরক-সংহিতার যে মূল-অগ্নিবৈশেষ্যসংহিতার সহিত অনেক পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই চরক কে—সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

পাণিনির “কঠচরকান্নক”—এই সূত্র দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে চরক পাণিনির পূর্বতন। কিন্তু এই মত বিচারসহ নহে। কারণ, পাণিনির কথিত কঠ ও চরক যজুর্বেদের শাখা বিশেষের প্রবক্তা দুইজন স্ববি। সেই চরক শুধু প্রতিসংস্কর্তা চরকের কেন,—আজ্ঞেয় অগ্নি-বেশাদিরও অনেক পূর্ববর্তী।

কেহ কেহ বলেন যে, চরক কাশ্মীর দেশীয় কনিষ্ক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। এই মতের মূল ত্রিপিটকাখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু এই চরকই যে বর্তমান চরক সংহিতার লেখক তাহা বোধ হয় না; কেননা তাহা হইলে কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী নামক ইতিহাসে কনিষ্ক প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্তা চরক-সংহিতা উল্লিখিত হইত।

আমাদের মতে ভগবান্ পতঞ্জলিই চরক-সংহিতার প্রতিসংস্কর্তা চরক মুনি। বিজ্ঞান-ভিক্ষু, ভোজরাজ, নাগেশভট্ট, রামভদ্র দীক্ষিত, ভাবমিশ্র প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থলিখিত বচন দ্বারাও এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায় *। পতঞ্জলি কেবল অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতি-সংস্কর্তা নহেন, রসশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার কথিত অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, শেবাবতার পতঞ্জলি মহুষ্যের মনের দোষ দূর করিবার জন্ত পাতঞ্জল দর্শন, বাক্যের দোষ নিবারণার্থ বৈয়াকরণ মহাভাষ্য এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্ত চরকসংহিতা প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই পতঞ্জলি যে দুই সহস্র বৎসর বা আরও কিছু পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ঐতিহাসিকগণ

অথগুনীয় যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দৃঢ়বল—কালে চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ সংহিতার বা চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পুনঃ প্রতিসংস্কার করেন। দৃঢ়বল কাশ্মীরে কিংবা পাঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই সম্বন্ধে উভয় প্রকার মতই প্রচলিত আছে। প্রথমটী ডাক্তার হর্ণলির মত ও দ্বিতীয়া সাধারণ মত। দৃঢ়বল-সংস্কৃত চরকের অনেক পাঠ বাগ্ভট স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, দৃঢ়বল বাগ্ভটের পূর্বে এবং পতঞ্জলির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান চরক-সংহিতার কোন্ কোন্ অংশ ঠিক চরকের লেখা সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বাগ্ভটের পূর্ববর্তী কোন কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও চরক-সংহিতায় পাঠ যোজনা করিয়াছেন, এরূপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রযুক্ত বাহুলা ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম না।

নাগার্জুন—লভ্যমান সূত্রসংহিতার প্রতিসংস্কর্তা কে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। উল্লন সূত্রতের চীকায় নাগার্জুনকেই সূত্রতের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার ভাবে + বোধ হয়, নাগার্জুন ভিন্ন অপর প্রতিসংস্কর্তারও পূর্বে প্রসিদ্ধি ছিল।

নাগার্জুনকে সূত্রতের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও এই নাগার্জুন কে, তাহা স্থির করা দুঃকর। প্রাচীন ইতিহাসে নাগার্জুন নামে প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লোহশাস্ত্রপ্রবক্তা রসতত্ত্বাচার্য্য এক

* এই প্রসঙ্গে যে সকল লেখা হইয়াছে, তাহার প্রমাণাদি “প্রত্যক্ষশারীর” গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। প্রযুক্ত বাহুলাভয়ে কোন স্থলেই সেসকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয় নাই। অমুসন্ধিৎসু পাঠক প্রয়োজন হইলে সেই সকল প্রমাণ দেখিয়া আমাদের মতের বিচার করিবেন।

+ “প্রতিসংস্কর্তাপীঠ নাগার্জুন এব”—উল্লন কৃত সূত্রত টিকা।